সমর্থন করেন। সিদ্ধ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত জীব; তাঁহার সহিত সংসারের কোনও সম্বন্ধ নাই। তিনি পৃথিবীর কোনও জীবের উপকারক নহেন, পৃথিবীর কোন জীবের দ্বারাও তিনি উপকৃত হন না। তিনি কোনও জীবকে মুক্তিপথে লইয়া যান না। তথাপি যদি কোনও জীব ভক্তিসহকারে সিদ্ধপুরুষবিষয়ে ভাবনা করে,—চিন্তা করিয়া দেখে যে, অনন্ত দর্শন-জ্ঞানাদি বিষয়ে স্বভাবতঃ সেও সিদ্ধের অনুরূপ,—তাহা হইলে ঐ জীব ধীরে ধীরে সিদ্ধত্বলাভের পথে অগ্রসর হয়। এ স্থলে দেখা যায় যে, প্রকৃত পক্ষে জীব স্বয়ংই মোক্ষপথের পথিক হইয়াছে; তথাপি সিদ্ধ পুরুষও যে তাহার মুক্তির কারণ, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। প্রকৃত পক্ষে ও প্রকৃষ্ট উপায়ে বস্তুসকলকে চালিত না করিলেও, ধর্ম্মও ঠিক এইরূপে তাহাদের গতিবিষয়ে কারণ বা হেতু।

লোকাকাশের বাহিরে ধর্ম্মতত্ত্বের অস্তিত্ব নাই। স্বভাবতঃ ঊর্দ্ধগতি হইলেও মুক্ত জীব এই জন্য বিশ্বশিখরস্থ সিদ্ধশিলায় অবস্থান করিয়া থাকেন এবং তদূর্দ্ধে অলোকাখ্য অনন্ত মহাশূন্যাকাশে বিচরণ করিতে পারেন না। যে সমস্ত কারণে লোকাকাশ অলোকাকাশ হইতে বিভিন্ন, লোকমধ্যে ধর্ম্মের অবস্থান তাহাদের অন্যতম। বিশ্বে বস্তুসমূহের অবস্থান এবং বিশ্ববস্তুসকলের নিয়মাধীনতা গতি-সাপেক্ষ। এই জন্য ধর্ম্মের জন্যই লোকাকাশ বা নিয়মসংবদ্ধ বিশ্ব সম্ভবপর হইয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে। অথচ ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, গতিবিষয়ে ধর্ম্ম সহায়ক কারণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। পদার্থসমূহ আপনা হইতেই গতিমান্ বা স্থিতিশীল হয় এবং স্থিতিশীল কোনও পদার্থকে ধর্ম্ম চালিত করিতে পারে না,—এই জন্যই বিশ্ববস্তুসমূহকে অনবরত আকাশে ছুটাছুটি করিতে দেখা যায় না। বিশ্বে যে নিয়ম ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, ধর্ম্ম তাহার অন্যতম কারণ, ইহা বলা যাইতে পারে।

অধ্যাপক শীলের মতে, ধর্ম্ম গতির সহায়ক কারণ তো বটেই, ইহা "তাহার অতিরিক্ত আরও কিছু।" তিনি বলেন,—"ইহা তাহার অতিরিক্ত আরও কিছু,—ইহা নিয়ম-নিবদ্ধ গতি-পরম্পরার (system of movements) কারক বা কারণ,—জীব ও পুদ্গলের গতি-সমূহের মধ্যে যে শৃঙ্খলা (order) রহিয়াছে, ধর্ম্মই তাহার কারণ।" তাঁহার মতে ধর্ম্ম কতকটা লাইব্‌নিট্‌সের "পূর্ব্বনিরূপিত শৃঙ্খলার (pre-established harmony)" অনুরূপ। প্রভাচন্দ্রের "সকৃদ্‌গতি যুগপদ্ভাবি গতি"—এই উক্তির উপর তিনি তাঁহার মতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। বস্তুসমূহের গতিসকলের মধ্যে যে শৃঙ্খলা বা নিয়ম দেখা যায়, ধর্ম্মই তাহার কারণ,—প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রভাচন্দ্রের অভিপ্রায় কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। উক্ত শৃঙ্খলার কারণসমূহের মধ্যে ধর্ম্ম অন্যতম, ইহা স্বীকার্য্য; কিন্তু বস্তু-সকলের শৃঙ্খলাবদ্ধ গতিবিষয়ে ধর্ম্মাতিরিক্ত অন্যান্য কারণেরও প্রয়োজন হয়, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। সরোমধ্যে মৎস্যপঙ্‌ক্তি যে শৃঙ্খলা সহকারে গতাগতি করে, সেই শৃঙ্খলাবিষয়ে সরোবরস্থ জলই যে একমাত্র কারণ, তাহা বলা যায় না। মীনপঙ্‌ক্তির উক্ত সুসম্বদ্ধ গতিবিষয়ে পুষ্করিণীস্থ জলের যেরূপ

কারণত্ব, মৎস্যসমূহের প্রকৃতিরও সেইরূপ কারণত্ব আছে। প্রমেয়-কমল-মার্ত্তণ্ডে প্রভাচন্দ্র বলিতেছেন,—

"বিবাদাপন্নসকলজীবপুদ্গলাশ্রয়াঃ সকৃদ্গতয়ঃ সাধারণবাহ্যনিমিত্তাপেক্ষাঃ যুগপদ্ভাবিগতিত্বাদেকসরঃসলিলাশ্রয়ানেকমৎস্যগতিবৎ। তথা সকলজীব-পুদ্গলস্থিতয়ঃ সাধারণবাহ্য-নিমিত্তাপেক্ষা যুগপদ্ভাবিস্থিতিত্বাদেককুণ্ডাশ্রয়ানেকবদরাদিস্থিতিবৎ। যত্তু সাধারণং নিমিত্তং স ধর্ম্মোঽধর্ম্মশ্চ তাভ্যাং বিনা তদ্গতিস্থিতিকার্য্যস্যাসম্ভবাৎ।"

উদ্ধৃত অংশের ভাবার্থ এইরূপ,—"সমস্ত জীব ও পৌদ্গলিক পদার্থসকলের গতিসমূহ একটী সাধারণ বাহ্য নিমিত্তের অপেক্ষা করে; কারণ, এই সমস্ত জীব ও পৌদ্গলিক পদার্থ-সমূহ যুগপৎ অর্থাৎ এককালেই গতিমান্ দেখা যায়। সরোবরে বহু মৎস্যের যুগপদ্গতি দেখিয়া যেরূপ উক্ত গতির সাধারণ নিমিত্তরূপে একটী সরোবরস্থ সলিলের অনুমান হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবপুদ্গলের গতি হইতে একটি সাধারণ নিমিত্তের অনুমান করিতে হইবে। সমস্ত জীব ও পৌদ্গলিক পদার্থসমূহের স্থিতিসমূহও একটী সাধারণ বাহ্য নিমিত্তের অপেক্ষা করে; কারণ, এই সমস্ত জীব ও পৌদ্গলিক পদার্থসকল যুগপৎ স্থিতিশীল দেখা যায়। একটী কুণ্ডে অনেক বদরের যুগপৎ স্থিতি দেখিয়া যেরূপ উক্ত স্থিতির সাধারণ নিমিত্তরূপে একটী কুণ্ডের অনুমান হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবপুদ্গলের স্থিতি হইতে একটী সাধারণ নিমিত্তের অনুমান করিতে হইবে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম যথাক্রমে এই সাধারণ নিমিত্ত; কারণ, এই দুইটী ব্যতিরেকে উপরোক্ত গতি-স্থিতিরূপ কার্য্য অসম্ভব।"

প্রভাচন্দ্রের উপরোদ্ধৃত বচন হইতে ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, একাধিক পদার্থের যুগপদ্গতি হইতে ধর্ম্মতত্ত্বের অস্তিত্ব অনুমেয়। কিন্তু যেরূপ একটী পদার্থ আর একটী পদার্থের পরে গেলেই যে তাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ, এরূপ বলা চলে না, সেইরূপ দুইটী বা ততোধিক পদার্থের যুগপদ্গতি হইতেই যে তাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ, এরূপ অনুমান করা যায় না। গতিসমূহ যুগপৎ হইলেই যে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবে, এমন কোনও কথা নাই। মনে কর, কোনও পুষ্করিণীতে একটী মৎস্য উত্তরদিকে ছুটিতেছে; একটী মনুষ্য পূর্ব্বদিকে সন্তরণ দিতেছে; বৃক্ষচ্যুত একটী পত্র পশ্চিমদিকে ভাসিয়া যাইতেছে এবং একটী উপলখণ্ড সরোবরের তলদেশের দিকে নামিয়া যাইতেছে। এই সমস্ত গতিই যুগপৎ এবং এই যুগপৎগতিসমূহ গতি-কারণ জলের জন্যই সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু এই সকল গতির মধ্যে যৌগপদ্য থাকিলেও, কেহই কোন শৃঙ্খলা দেখিতে পায় না। সেইরূপ ধর্ম্ম যুগপৎ গতিসমূহের কারণ হইলেও, ইহাকে তদন্তর্গত শৃঙ্খলার কারণ বলা যাইতে পারে না। ধর্ম্ম জৈনদর্শনে নিষ্ক্রিয় পদার্থ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। গতিপরম্পরার শৃঙ্খলায় ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা আছে, ইহা স্বীকার্য্য; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, —ধর্ম্ম ক্রিয়াশীল বস্তু নহে এবং সেই জন্য বিশ্বের গতিসমূহের মধ্যে যে শৃঙ্খলা আছে, ধর্ম্মকে তাহার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না।

সেই কারণে আমাদের মনে হয়, অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিতবর শীলের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতবাদের

যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু গতিসমূহের শৃঙ্খলার কারণ আবিষ্কার করিতে যাইয়া অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী অধর্ম্মতত্ত্বকে আনিয়া ফেলিয়াছেন। স্থিতিকারণ অধর্ম্ম "যুক্তিতঃ" ধর্ম্মের "পূর্ব্বগামী" (logically prior) এবং অধর্ম্মের ফল বা কার্য্য নিরাস অথবা কিয়ৎপরিমাণে মন্দীভূত করিবার জন্য ধর্ম্মের প্রচেষ্টায় শৃঙ্খলার উৎপত্তি হইয়াছে;—বোধ হয়, ইহাই তাঁহার অভিমত। সুবিজ্ঞ অধ্যাপকের এই মত আমরা গ্রহণ করিতে অক্ষম। বিস্মৃত হইলে চলিবে না,—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, দুইটাই নিষ্ক্রিয় তত্ত্ব। তাহাদের অস্তিত্বের ফলে গতি-শৃঙ্খলার আবির্ভাব সহায়তা লাভ করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু গতি-শৃঙ্খলার উৎপাদন-ব্যাপারে তাহাদের ক্রিয়াকারিত্ব একেবারেই নাই।

প্রকৃত কথা এই যে—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, আকাশ অথবা কাল, মিলিতভাবে অথবা পৃথক্‌ভাবে বস্তুসকলের গতিপরম্পরার মধ্যে শৃঙ্খলাবিধান করিতে সমর্থ নহে। উহাদের অস্তিত্ব ঐ শৃঙ্খলাবিষয়ে সহায়ক বলিয়া পরিগণিত হইলেও, উহারা সর্ব্বথা নিষ্ক্রিয় দ্রব্য। বিশ্বনিয়মের কারণ নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া অদ্বৈতবাদ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" সৎপদার্থের অবতারণা করিয়া থাকে এবং ঈশ্বর-বাদ এক মহীয়ান্ স্রষ্টা নির্দ্দেশ করে। জৈনদর্শন অদ্বৈতবাদ ও স্রষ্টৃবাদ, উভয়েরই বিরোধী। কাজে কাজেই শৃঙ্খলাবদ্ধ গতিসমূহের এবং সেই সঙ্গে বিশ্বান্তর্গত নিয়মের কারণ নির্দ্ধারণ করিতে জৈনগণ স্বতঃ গতিশীল জীব ও পুদ্গলের স্বাভাবিক প্রকৃতির উপরই নির্ভর করিতে বাধ্য। সমস্ত জীবের মধ্যেই একই জীবগুণসমূহ বিদ্যমান; তজ্জন্য সকল জীবের কর্ম্মসমূহ ও ক্রিয়াপদ্ধতি অনেকটা একপ্রকারেরই হইয়া থাকে। আবার একই কাল, আকাশ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও পুদ্গলের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া সকল জীবকেই কর্ম্ম করিতে হয়; এ নিমিত্তও জীবগণের মধ্যে একটা নিয়ম ও শৃঙ্খলার আবির্ভাব হইয়া থাকে। জড় জগতের শৃঙ্খলা সম্বন্ধে আমাদের মনে হয়, জৈন-দর্শন আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত মত গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিবে না। বর্ত্তমান যুগের জড়বিজ্ঞানাচার্য্যগণের মত জৈনগণও বলিতে পারেন যে, জড়জগতের যে শৃঙ্খলা, তাহা জড় পদার্থের স্বাভাবিক গুণ হইতে প্রসূত। জড়ের সংস্থান (mass) এবং গতি (motion), কেন্দ্র-স্থিতি-নিয়ম (law of gravity) এবং জড়নিহিত আকর্ষণ-বিকর্ষণ-শক্তি (principles of attraction and repulsion) হইতেই জড় জগতের শৃঙ্খলার উদ্ভব। জড় ব্যাপারসমূহের (purely material phenomena) মধ্যে যে নিয়ম দেখা যায়, তাহার প্রতিষ্ঠা-বিষয়ে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, আকাশ ও কালের অস্তিত্ব একান্ত সহায়ক, ইহাও এ স্থলে স্বীকার্য্য। জগন্মধ্যে জীবসমূহের অস্তিত্বও জড়জগতের শৃঙ্খলার পোষক; কারণ অনাদিকাল হইতে যে সমস্ত বদ্ধজীব সংসারমধ্যে ছুটাছুটি করিতেছে, পুদ্গল বা জড়দ্রব্য তাহাদেরই প্রয়োজন ও অভীপ্সা অনুসারে ক্রমাগতঃ অবস্থান্তরিত হইয়া আসিতেছে। এইরূপে দেখা যায় যে বস্তু সমূহের গতির মধ্যে যে শৃঙ্খলা, তাহা মূলতঃ বস্তুরই ক্রিয়াশীল প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত এবং ধর্ম্মতত্ত্বের অস্তিত্বই যে কেবল এই শৃঙ্খলা-প্রতিষ্ঠার সহায়ক তাহা নহে, অধর্ম্ম আকাশ প্রভৃতি তত্ত্বও উহার পরিপোষক। গতি-স্থিতি-বিষয়ে পদার্থের স্বভাবই

কর্তৃত্বাধিকারী, ইহা তত্ত্বার্থরাজবার্ত্তিককার বিশেষভাবে বলিয়াছেন এবং তিনি ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে "উপগ্রাহক" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, অন্ধ ব্যক্তি ভ্রমণকালে যষ্টির সাহায্য গ্রহণ করে ; যষ্টি তাহাকে ভ্রমণ করায় না, তাহার ভ্রমণ-ব্যাপারে সহায়তা করে মাত্র। যদি যষ্টি ক্রিয়াশীল কর্ত্তা হইত, তাহা হইলে ইহা অচেতন ও নিদ্রিত ব্যক্তিকেও ভ্রমণ করাইত। এই জন্ত অন্ধের গতিবিষয়ে যষ্টি উপগ্রাহক। দৃষ্টি-ব্যাপারে আবার আলোক সাহায্যকারী। চক্ষুরই দৃষ্টিশক্তি আছে,—আলোক দৃষ্টিশক্তির জনয়িতা নহে। আলোক যদি ক্রিয়াশীল কর্ত্তা হইত, তাহা হইলে ইহা অচেতন ও নিদ্রিত ব্যক্তিকেও দর্শন করাইত। এই জন্য দৃষ্টিব্যাপারে আলোক উপগ্রাহক। তিনি বলেন,—"ঠিক সেই প্রকারেই জীবসমূহ ও জড় পদার্থসকল আপনা হইতে গতিমান্ অথবা স্থিতিশীল হয়। তাহাদের সেই গতি ও স্থিতি-ব্যাপারে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উপগ্রাহক অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় হেতু। তাহারা ঐ গতি ও স্থিতির 'কর্ত্তা' বা জনয়িতা নহে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম যদি গতি ও স্থিতির কর্ত্তা হইত, তাহা হইলে গতি ও স্থিতি অসম্ভব হইত।" ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সক্রিয় দ্রব্যরূপে কল্পিত হইলে জগতে গতি ও স্থিতি কি জন্য অসম্ভব হইত, তাহাও তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সর্ব্বব্যাপক, লোকাকাশের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। অতএব যখনই ধর্ম্ম কোন বস্তুকে পরিচালিত করিবে, তখনই অধর্ম্ম তাহাকে থামাইয়া দিবে ; এইরূপে জগতে গতি একটা অসম্ভব ব্যাপার হইয়া উঠিবে। আবার অধর্ম্ম যখনই কোনও বস্তুকে স্থিতিশীল করিবে, তখনই ধর্ম্ম তাহাকে সঞ্চালিত করিবে ; এইরূপে জগতে স্থিতি একটা অসম্ভব ব্যাপার হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত অকলঙ্কদেব বলেন যে, যদি ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নিষ্ক্রিয় দ্রব্যের অতিরিক্ত আর কিছু হইত, তাহা হইলে জগতে গতি ও স্থিতি অসম্ভব হইত। গতি ও স্থিতি জীবসমূহ ও জড়পদার্থ-সকলের ক্রিয়া-সাপেক্ষ। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম গতি ও স্থিতির সহায়ক এবং এক হিসাবে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের জন্যই গতি ও স্থিতি সম্ভবপর হইয়া থাকে। এই স্থলে আমরা আর একটু অগ্রসর হইয়া কি এ কথা বলিতে পারি না যে, —শৃঙ্খলাবদ্ধ গতি ও শৃঙ্খলাবদ্ধ স্থিতিও জীব ও জড় পদার্থসমূহের স্বাভাবিক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে এবং উহাদের সহায়ক ও অপরিহার্য্য হেতু হইলেও ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম মিলিতভাবে অথবা পৃথগ্‌ভাবে গতি-স্থিতি-শৃঙ্খলার জনয়িতা (cause) নহে ?

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম প্রত্যক্ষের বিষয় নহে এবং তন্নিমিত্ত উহারা সৎপদার্থ নহে,—জৈনগণ এরূপ বিচারকে নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচনা করেন। প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত অনেক পদার্থকেই আমরা সত্য বলিয়া মানিতে বাধ্য এবং মানিয়া থাকি। পদার্থসমূহ যখন গতিশীল বা স্থিতিমান্ দেখা যাইতেছে, তখন অবশ্যই এমন দ্রব্য আছে, যাহা তাহাদের গতি ও স্থিতি-ব্যাপারে সাহায্য করে—ইত্যাকার যুক্তিতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সত্তা ও দ্রব্যত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, আকাশই গতিকারণ এবং আকাশাতিরিক্ত ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। জৈনদার্শনিকগণ এই মতবাদের অসারতা প্রতিপাদন-কল্পে নির্দ্দেশ করেন যে, অবকাশ-প্রদানই আকাশের গুণ ; এই অবকাশ-প্রদান গতিশীল পদার্থের গতি-

ব্যাপারে সাহায্যদান হইতে বিভিন্ন, ইহা সহজেই বুঝা যায়। গুণদ্বয়ের এই মৌলিক বিভিন্নতা মূলতঃ বিভিন্ন দুইটী দ্রব্যের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করে এবং এই নিমিত্ত ধর্ম্মতত্ত্ব আকাশ হইতে পৃথক্ দ্রব্য। আরও দেখা যায় যে, যদি আকাশ গতি-কারণ হইত, তাহা হইলে বস্তুসমূহ অলোকে প্রবেশ করিয়া লোকাকাশের ন্যায় তথায়ও ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে পারিত। অলোক আকাশের অংশ হইয়াও যে একেবারে শূন্য ও পদার্থপরিবর্জ্জিত (এমন কি, সিদ্ধগণও তথায় প্রবেশ করিতে পারেন না),—ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, ধর্ম্ম একটী সৎ-দ্রব্য, অলোকে ইহার অস্তিত্ব নাই, এবং ইহা লোকমধ্যে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া লোকাকাশ ও অলোকাকাশের মধ্যে একটা বিশাল বিভিন্নতা প্রতিপাদন করিয়াছে। অদৃষ্টই গতি-কারণ,—ধর্ম্মের সত্তা নাই,—ইহাও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, চেতন জীব যে শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া থাকে, অদৃষ্ট তাহারই ফলরূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকে। চেতন জীবের গতাগতিবিধানে অদৃষ্ট সমর্থ, ইহা তর্কস্থলে মানিয়া লইলেও,—পাপপুণ্যকর্ম্মের অকর্ত্তৃ এবং তজ্জন্য অদৃষ্টের সহিত সর্ব্বথা অসংশ্লিষ্ট যে জড় পদার্থসমূহ, তাহাদের গতির কারণ কি হইবে ? এ স্থলে ইহা স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, জৈনমতে ধর্ম্ম, পদার্থের চালনকারী কোনও দ্রব্য নহে, ইহা বস্তুর গতি-ব্যাপারে সাহায্যদান করে মাত্র। গতিবিষয়ে ধর্ম্মের ন্যায় একটী নিষ্ক্রিয় কারণ অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য। অদৃষ্টের সত্তা স্বীকার করিলেও তদ্দ্বারা ধর্ম্ম একটী সৎ-অজীব দ্রব্য এই মতবাদের কোনওরূপ বাধ হয় না।

(২)

অধর্ম্ম

জগদ্ব্যাপারের ভিত্তি অন্বেষণ করিতে যাইয়া অনেক দর্শনই,—বিশেষতঃ প্রাচীন দর্শনসমূহ —দুইটী বিরোধী তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া থাকে। জরথুস্ত্র-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে আমরা "অহুরো মজ্‌দ" ও "আহরিমান্" নামে দুইটী পরস্পর-বিবদমান হিতকারী ও অহিতকারী দেবতার পরিচয় পাই। প্রাচীন য়িহুদী-ধর্ম্মে ও খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে ঈশ্বর ও ঈশ্বরের চিরশত্রু শয়তান বর্ত্তমান। দেব ও অসুর লইয়া ভারতের পুরাতন ধর্ম্মকথা। ধর্ম্মবিশ্বাসের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি আমরা দার্শনিক তত্ত্ববিচারের আলোচনা করি, তাহা হইলে সেখানেও দ্বৈতবাদের একটা প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত দ্বৈতবাদের মধ্যে আত্মা ও অনাত্মার বিভেদ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং এই বিভেদ-কল্পনা প্রায় প্রত্যেক দর্শনেই কোনও না কোনও প্রকারে নিহিত। সাংখ্যে এই দ্বৈত পুরুষ-প্রকৃতি-ভেদ-রূপে বর্ণিত ; আবার বেদান্তে ব্রহ্ম ও মায়ার সম্বন্ধের বিচারের মধ্যে উহারই কতকটা আভাস পাওয়া যায়। কার্টিসীয় দার্শনিকগণ আত্মা ও জড়ের বিভিন্নতা দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং উহাদের সমন্বয়-সাধনে বৃথা প্রয়াস করিয়াছিলেন। জৈন-দর্শনে

জীব ও অজীব পরস্পর-বিভিন্ন মূল-তত্ত্ব। এই সমস্ত দ্বৈতবাদ ব্যতীত দার্শনিকগণ আরও অনেক দ্বৈত স্বীকার করিয়া থাকেন, যথা—সৎ-ও-অসৎ (Being and Non-Being), তত্ত্ব-ও-পর্য্যায় (Noumenon and Phenomenon) প্রভৃতি।

প্রাচীন গ্রীকগণ আর একটা সুপ্রসিদ্ধ বিভেদ পরিকল্পনা করিয়াছিলেন,—তাহা গতি ও স্থিতির মধ্যে। হেরাক্লিটাসের শিষ্যগণের মতে স্থিতি একটা প্রকৃত তাত্ত্বিক ব্যাপার নহে, প্রতি পদার্থ প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং এইরূপে প্রতি পদার্থ প্রতি মুহূর্ত্তেই গতিশীল, ইহা বলা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে আবার পার্ম্মেনিডিসের শিষ্যগণ বলিতেন,—গতি অসম্ভব, অপরিবর্ত্তনীয় স্থিতিই প্রকৃত তত্ত্ব। এই দুই পক্ষের বাদানুবাদ হইতে গতি ও স্থিতি, উভয়েরই সত্যতা ও তাত্ত্বিকতা উপলব্ধ হইয়া থাকে। যাঁহারা কেবলমাত্র তত্ত্ববিচারের পক্ষপাতী না হইয়া লোক-ব্যবহারের প্রতিও দৃষ্টি রাখেন, তাঁহারা গতি ও স্থিতির মধ্যে কোনও একটীর সত্যতা একেবারে উড়াইয়া দিয়া, অপরটীর তাত্ত্বিকতা ঘোষণা করিতে পারেন না। জৈনগণ অনেকান্তবাদী; অতএব তাঁহারা যে গতি-কারণ ধর্ম্ম ও স্থিতি-কারণ অধর্ম্ম, উভয়েরই তাত্ত্বিকতা স্বীকার করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই।

ধর্ম্মের জন্য গতি ও অধর্ম্মের জন্য স্থিতি—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দুইটীই সৎ-দ্রব্য, অজীবাখ্য অনাত্ম-তত্ত্বের অন্তর্গত। দুইটীই লোকাকাশ-ব্যাপী সর্ব্বগত ব্যাপক পদার্থ। মহাশূন্য অলোকে দুইটীরই অস্তিত্ব নাই। "ধর্ম্ম তাহার অতিরিক্ত আরও কিছু,—ইহা নিয়ম-নিবদ্ধ গতি-পরম্পরার কারক বা কারণ,—জীব ও পুদ্গলের গতিসমূহের মধ্যে যে শৃঙ্খলা রহিয়াছে, ধর্ম্মই তাহার কারণ।"—এরূপ মনে করা বোধ হয়, যুক্তিসঙ্গত নহে। জৈন দর্শনের মতে জীব ও পুদ্গল, উভয়েই আপনা হইতে গতিশীল এবং ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় দ্রব্য; অতএব ধর্ম্ম বিশ্বের অন্তর্গত শৃঙ্খলার বিধায়ক, এরূপ বলা চলে না। অধর্ম্মও নিষ্ক্রিয় দ্রব্য। জীব ও পুদ্গল আপনা হইতেই স্থিতিশীল হয়। জগতে যদি শৃঙ্খলাবদ্ধ স্থিতি থাকে, তাহা হইলে অধর্ম্মকে তাহার কারণ বলিলে চলিবে না,—জীব ও পুদ্গলের স্বভাবই তাহার কারণ। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের মধ্যে কোনটীই জগদনুপ্রবিষ্ট নিয়মের কর্ত্তা নহে। আবার উহাদের মধ্যে কোনটীকে অপরটীর "যুক্তিতঃ পূর্ব্বগামী (logically prior)" বলাও চলে না। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের মধ্যে একটী অপরটীর ব্যাপারের প্রতিক্রিয়া করিতেছে এবং এই চির-বিরোধ বা অনন্ত-সংগ্রামের উপর বিশ্ব-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত, এরূপ মনে করা যুক্তিবিরুদ্ধ হইবে। গ্রীক দার্শনিকের উদ্ভাবিত "রাগ" (principle of love) ও "দ্বেষ" (principle of hate) এই দুইটীর সহিত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের তুলনা করা চলে না। ধর্ম্মকে "বহির্ম্মুখী-গতি-কারণ (principle "guaranteeing motion within limits") এবং অধর্ম্মকে "অন্তর্ম্মুখী-গতি-কারণ" বা "মাধ্যাকর্ষণ-কারণ (principle of gravitation) বলিলেও, আমাদের মনে হয়—ভুল হইবে। পরমাণুকায়-সংরক্ষণে যে দুইটা পরস্পর-বিরোধী (positive and negative) তাড়িৎ-শক্তির ব্যাপার (electro-magnetic influences) পরিলক্ষিত

হয়, তাদৃশ পরস্পর-বিরোধী কোন তত্ত্বদ্বয়ের সহিতও ধর্ম্মাধর্ম্মের তুলনা করা চলে না। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় দ্রব্য ; যেমন "কেন্দ্রাভিমুখী ও কেন্দ্রবহির্গামী গতি"র) centripetal and centrifugal forces) সহিত তাহাদের সাদৃশ্য নাই,—সেইরূপ তাহাদের উপর কোনও প্রকার ক্রিয়াকারিত্বের (dynamic energising) আরোপ করা চলে না।

জৈন-দর্শনে অধর্ম্মের অর্থ পাপ বা নীতিবিরুদ্ধ অপকর্ম্ম নহে। ইহা একটী সৎ অজীব তত্ত্ব ; বস্তুসকলের স্থিতিশীলতার ইহা অন্যতম কারণ। জীবসমূহ ও জড় বস্তুসকলের "স্থিতি-কারণ" বলিয়া ইহা বর্ণিত হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা অধর্ম্ম গতিশীল পদার্থকে থামাইয়া দেয়, এরূপ অর্থ সূচিত হয় না। অধর্ম্ম স্থিতির কারক-সহভাবী কারণ। দ্রব্যসংগ্রহকার ইহাকে "ঠাণজুদাণ ঠাণসহয়ারী" (স্থানযুতানাং স্থানসহকারী) অর্থাৎ স্থিতিশীল পদার্থের স্থিতি-সহায়ক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। "স্থিতিশীল পদার্থের স্থিতিবিষয়ে যাহা সাহায্য করে, বিশুদ্ধ-দর্শন জিনগণ তাহাকেই অধর্ম্ম বলিয়াছেন ; গো-গণের স্থিতিবিষয়ে পৃথিবী যেমন সাধারণ আশ্রয়, সেইরূপ জীব ও পুদ্গলসমূহের স্থিতি-ব্যাপারে অধর্ম্ম সাধারণ আশ্রয় (তত্ত্বার্থসার, তৃতীয় অধ্যায়, ৩৫।৩৬)।" গমন-শীল গো-সমূহকে পৃথিবী থামাইয়া দেয় না ; অথচ পৃথিবী না থাকিলে তাহাদের স্থিতিও অসম্ভব ; সেইরূপ অধর্ম্ম গতিশীল কোনও বস্তুকে থামাইয়া দেয় না ; অথচ অধর্ম্ম ব্যতীত গতিশীল পদার্থের স্থিতিও অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে, জৈন লেখকগণ অধর্ম্মের সহিত ছায়ারও তুলনা করেন। "ছায়া যেরূপ তাপদগ্ধ প্রাণিগণের এবং পৃথিবী যেরূপ অশ্বগণের,— অধর্ম্মও সেইরূপ পুদ্গলাদি দ্রব্যের স্থিতিকারণ।"

অধর্ম্ম "অকর্ত্তা" অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় তত্ত্ব। ইহা বস্তুসকলের স্থিতির হেতু বা কারণ হইলেও কদাপি ক্রিয়াকারী (dynamic or productive) কারণ নহে। এই জন্য অধর্ম্ম স্থিতির "বহিরঙ্গ হেতু" বা "উদাসীন হেতু" বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। ইহা "নিত্য" ও "অমূর্ত্ত" ; স্পর্শ, রস, গন্ধাদি গুণ ইহাতে নাই। এই সমস্ত বিষয়ে ধর্ম্ম, কাল ও আকাশের সহিত অধর্ম্মের সাদৃশ্য আছে। ইহার বিশিষ্ট গুণ আছে এবং ইহা বস্তু-স্থিতি-পর্য্যায়সমূহের আধার বলিয়া অধর্ম্ম একটী সৎ দ্রব্য। দ্রব্যত্ব-হিসাবে অবশ্য অধর্ম্ম জীব-সদৃশ। জীবের ন্যায় ইহাও অনাদ্যনন্ত ও অপৌদ্গলিক (immaterial)। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অধর্ম্ম অজীব অর্থাৎ অনাত্ম-দ্রব্য।

ধর্ম্ম, কাল, পুদ্গল ও জীবের ন্যায় অধর্ম্ম লোকাকাশের মধ্যেই অবস্থিত। অনন্তাকাশে ইহার অস্তিত্ব নাই। অধর্ম্ম বর্ত্তমান (অস্তি) ও প্রদেশবিশিষ্ট (কায়) বলিয়া পঞ্চ অস্তিকায়ের মধ্যে ইহা অন্যতম। একটী অবিভাজ্য পুদ্গল-পরমাণুদ্বারা যতটুকু স্থান অবরুদ্ধ হইয়া থাকে তাহার নাম 'প্রদেশ'। অধর্ম্ম লোকাকাশের সীমার মধ্যে অবস্থিত বলিয়া ইহার প্রদেশসমূহ অনন্ত নহে ; এগুলি নির্দ্দিষ্ট সীমার অন্তর্গত বলিয়া ইহাদের শেষ আছে। জৈনগণ অধর্ম্ম, ধর্ম্ম ও জীবের প্রদেশসমূহকে "অসংখ্যা" অর্থাৎ সংখ্যাকরণের অযোগ্য বলিয়া থাকেন।

অধর্ম্ম উক্তরূপে "অসংখ্যেয়প্রদেশ" হইলেও ইহা এক—একটীমাত্র ব্যাপক পদার্থ। ইহা বিশ্বব্যাপী ("লোকাবগাঢ়") এবং বিস্তৃত ("পৃথুল")। ধর্ম্মের ন্যায় অধর্ম্মেরও প্রদেশ-সমূহ পরস্পরসংশ্লিষ্ট, সেই জন্য অধর্ম্ম একটী ব্যাপক সম্পূর্ণ ("স্পৃষ্ট") পদার্থ বলিয়া কথিত হয়। এই বিষয়ে কাল-তত্ত্বের সহিত অধর্ম্মের পার্থক্য আছে, কালাণুসমূহ পরস্পর-বিভিন্ন।

ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে কি মূলতঃ একই দ্রব্য বলা যাইতে পারে? উভয়েই লোকাকাশব্যাপী, অতএব উভয়েরই "দেশ" এক। উভয়েরই "সংস্থান" অর্থাৎ পরিমাণ এক। উভয়েই এক "কালে" স্থায়ী। দার্শনিক একই "দর্শন" অর্থাৎ প্রমাণের সাহায্যে উভয়েরই অস্তিত্ব অনুমান করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম "অবগাহন"তঃ এক অর্থাৎ উভয়ে পরস্পর গাঢ়-সংশ্লিষ্ট। উভয়েই তত্ত্ব-"দ্রব্য", অমূর্ত্ত ও জ্ঞেয়। অতএব ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামে দুইটী বিভিন্ন দ্রব্য গণনা না করিয়া, দুইটীকে একই দ্রব্য বলিলে দোষ কি? ইহার উত্তরে তত্ত্বার্থরাজ-বার্ত্তিককার বলেন,—ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কার্য্য বিভিন্ন; এই জন্য ইহারা বিভিন্ন দ্রব্য। একই পদার্থে, একই সময়ে রূপ, রস ও অন্যান্য ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু তজ্জন্য রূপ-রসাদি ব্যাপারসমূহকে একই ব্যাপার বলিতে হইবে কি?

আকাশ-তত্ত্বকে গতি বা স্থিতির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সত্তা অস্বীকার করা যায় না। অবকাশ অর্থাৎ স্থানদানই আকাশের লক্ষণ; নগরে যেরূপ গৃহাদি অবস্থিত, সেইরূপ ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও অন্যান্য দ্রব্যসমূহ আকাশে অবস্থিত। যদি স্থাপনা ও চালনা আকাশের গুণ হইত, তাহা হইলে অনন্ত, মহাশূন্য, অলোকেও ঐ সকল গুণের অসদ্ভাব হইত না। অলোকাকাশে গতিস্থিতি সম্ভবপর হইলে লোকাকাশ এবং অনন্তাকাশে কোনও প্রভেদ থাকিত না। শৃঙ্খলাবদ্ধ লোক ও অনন্ত অলোকের পার্থক্য হইতেই বুঝা যায় যে, আকাশে গতি-স্থিতি-কারণত্বের আরোপ করা চলে না এবং গতিস্থিতির কারণ বা আধাররূপে ধর্ম্মাধর্ম্মের সত্তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অবকাশ-দায়ক আকাশ ব্যতিরেকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কোন কার্য্য হইতে পারে না, ইহা সত্য; কিন্তু তজ্জন্য আকাশের সহিত যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কোনও প্রভেদ থাকিবে না, এমন কথা নাই বৈশেষিক দর্শনে দিক্, কাল ও আত্মা পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। আকাশ ব্যতিরেকে ইহাদের মধ্যে কাহারও কোন কার্য্য হইতে পারে না; অথচ ইহাদের সকলের হইতে আকাশের পৃথক্ সত্তা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যদি একই দ্রব্যে বিভিন্ন বিভিন্ন কার্য্যের আরোপ করা চলিত, তাহা হইলে ন্যায়দর্শন-সম্মত আত্মার নানাত্ব-বাদের যৌক্তিকতা কোথায়? এবং সাংখ্যদর্শন যে সত্ত্ব, রজস্ ও তমস্ নামে তিনটী বিভিন্ন গুণ প্রকৃতিতে আরোপ করিয়া থাকেন, তাহাই বা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হয়? উক্ত গুণত্রয়ের একটী, তিনটী বিভিন্ন প্রকারে কার্য্যকর হয়, ইহা বলিলেই তো চলিত। মূলতঃ বিভিন্ন কার্য্যসমূহের কারণ এক হইলে, সাংখ্যের পুরুষনানাত্ববাদও অপ্রতিপন্ন হয়। বৌদ্ধদর্শন রূপস্কন্ধ,

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ নামে পাঁচটী বিভিন্ন স্কন্ধের উল্লেখ করিয়া থাকেন; শেষোক্ত স্কন্ধ ব্যতিরেকে অন্যান্য স্কন্ধ অসম্ভব হইলেও বৌদ্ধগণ পাঁচটী স্কন্ধই স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং একটী পদার্থ আর একটি পদার্থের উপর নির্ভর করিলেও যদি উভয়ের কার্য্যের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ থাকে, তাহা হইলে দুইটী পদার্থেরই পৃথক্ সত্তা স্বীকার করিতে হয়।

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অমূর্ত্ত দ্রব্য; অতএব তাহারা কিরূপে অন্য পদার্থের গতিস্থিতি-বিষয়ে সহায়ক হইবে?—এরূপ সংশয় করিবার কারণ নাই। দ্রব্য অমূর্ত্ত হইলেও কার্য্যকারী হইতে পারে। আকাশ অমূর্ত্ত হইয়াও অন্যান্য পদার্থকে অবকাশ প্রদান করে। সাংখ্যদর্শন-সম্মত প্রধানও অমূর্ত্ত; অথচ পুরুষের জন্য ইহার জগৎ-প্রসবিতৃত্ব স্বীকৃত হয়। বৌদ্ধদর্শনের বিজ্ঞান অমূর্ত্ত হইয়াও নাম-রূপাদি উৎপাদনের কারণ। বৈশেষিক সম্মত অপূর্ব্বই বা কি? ইহাও অমূর্ত্ত; অথচ ইহা জীবের সুখদুঃখাদির নিয়ামক। সুতরাং ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অমূর্ত্ত হইলেও কার্য্যকর, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সাধারণতঃ নৈতিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; জৈন-দর্শনে উহারা দ্রব্য, দুইটী অজীব তত্ত্ব। কেহ কেহ ধর্ম্মাধর্ম্মের এই দুইটী অর্থের মধ্যে একটী সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতে প্রয়াস পান,—উপসংহারে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। ধর্ম্ম গতি-কারণ ও অধর্ম্ম স্থিতি-কারণ। নৈতিক অর্থে ধর্ম্ম পুণ্যকর্ম্ম ও অধর্ম্ম পাপকর্ম্ম। কাহারও কাহারও মতে, ধর্ম্মের 'গতি-কারণ' এই তাত্ত্বিক অর্থই আদিম ও সুপ্রাচীন; উত্তরকালে ইহা হইতেই ধর্ম্মের নৈতিক অর্থের উদ্ভব হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, জীবদ্রব্য স্বভাবতঃ "উড্ঢগঈ" (ঊর্দ্ধগতি)। অর্থাৎ বিশুদ্ধ-স্বভাবে ইহা যতই অবস্থিত হইবে, ততই ইহা ঊর্দ্ধগতি হইয়া লোকাকাশ-শিখরের দিকে অগ্রসর হইবে। ধর্ম্ম গতিকারণ; অতএব সুখময় ঊর্দ্ধলোকে গমনবিষয়ে যাহা জীবের সহায়ক, তাহাকে ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। এ দিকে আবার পাপস্পর্শশূন্য পুণ্য কর্ম্ম করিয়াই জীব ঊর্দ্ধলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়। এই কারণে যে ধর্ম্মশব্দ পূর্ব্বে জীবের ঊর্দ্ধগতিবিষয়ে যাহা সহায়ক, এই অর্থ প্রকাশ করিত, কালে তাহাই পুণ্যকর্ম্ম-বাচকরূপে পরিগণিত হইল। সেইরূপ, অধর্ম্ম জীবের স্থিতি-বিষয়ে সহায়ক, মূলতঃ এই অর্থের বাচক হইয়া, উত্তরকালে যদ্দ্বারা জীব সংসারে আবদ্ধ থাকে, সেই পাপকর্ম্মের বাচক হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এই মতবাদে আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম শব্দের তাত্ত্বিক ও নৈতিক অর্থদ্বয়ের মধ্যে উপরে যে সম্বন্ধস্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে, তাহা যুক্তিগতও (logical) নহে, কালগতও (chronological) নহে। জীবের যে স্বাভাবিক ঊর্দ্ধগতি, শুধু সেই ঊর্দ্ধগতিবিষয়েই ধর্ম্ম সহায়ক, এরূপ মনে করা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? জৈনদর্শনে ধর্ম্ম সর্ব্ববিধ গতিরই কারণ, ইহা বলা হইয়াছে। জীবের গতিবিষয়ে ইহা যেরূপ সাহায্যদান করে, পুদ্গলের গতিবিষয়েও ইহা সেইরূপ সহায়তা করে। সর্ব্ববিধ গতির কারণ ধর্ম্ম, জীবকে

শুধু ঊর্দ্ধগতিবিষয়েই সাহায্য করে, ইহাই বা কিরূপে মনে করা যাইতে পারে? যখন জীব জৈনসম্মত সপ্তসংখ্যক নরকসমূহের অন্ততমে গমন করে,—আমরা মনে করি,—জীবের সেই অধোগতি-ব্যাপারেও ধর্ম্ম সহায়ক। ধর্ম্মতত্ত্ব ঊর্দ্ধগতির যেরূপ সহায়ক, অধোগতির ঠিক সেইরূপই সহায়ক। সেই জন্য ধর্ম্মশব্দের 'গতি-কারণ' এই তাত্ত্বিক অর্থের সহিত উহার 'পুণ্যকর্ম্ম' এই নৈতিক অর্থের কোনও প্রকার সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। অধর্ম্ম সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, এই তত্ত্ব দুঃখময় সংসার অথবা যন্ত্রণাসঙ্কুল নরকসমূহে জীবের স্থিতি যেমন সম্ভবপর করে, তেমনই আবার আনন্দধাম ঊর্দ্ধলোকে জীবের স্থিতি-বিষয়ে সহায়তা করে। অতএব স্থিতিকারণ অধর্ম্মের সহিত পাপকর্ম্ম অধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আবার এ কথাও বলা যায় না যে, পুণ্যকর্ম্মসাধনে একটা প্রযত্নশীলতা থাকে এবং পাপকর্ম্মে একটা জড়তা বিদ্যমান, তজ্জন্য গতি-কারণ-বাচক ধর্ম্ম-শব্দের সহিত পুণ্যকর্ম্ম-বাচক ধর্ম্ম-শব্দের একটা সম্বন্ধ আছে এবং স্থিতিকারণ-বাচক অধর্ম্ম-শব্দের সহিত পাপকর্ম্ম-বাচক অধর্ম্ম-শব্দের একটা সম্বন্ধ আছে। জৈন-ধর্ম্ম-নীতিতে কেন, ভারতীয় প্রায় সমস্ত ধর্ম্মনীতিতেই ইহা একরূপ স্বীকৃত যে, পুণ্যবান্, সুকর্ম্মী বা ধর্ম্মসাধক ক্রিয়াবান্ না হইতেও পারেন। অচঞ্চল স্থিতি বা চির-গম্ভীর ধৈর্য্য ভারতীয় ধর্ম্মনীতির অনেক স্থলেই প্রশংসিত—এবং ইহাই সাধনার মূল ও লক্ষ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এ দিক্ দিয়া দেখিলে, ধর্ম্ম অপেক্ষা অধর্ম্মই সমধিক পরিমাণে ধর্ম্মপোষক, ইহা বলা যাইতে পারে।

প্রকৃত কথা এই যে, গতি-স্থিতি-কারণরূপে ধর্ম্মাধর্ম্মের তাত্ত্বিকতা-স্বীকার জৈনদর্শনের একটী বিশিষ্টত্ব। উহাদের নৈতিক ও তাত্ত্বিক অর্থদ্বয়ের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনের প্রয়াস সর্ব্বথা বিফল বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য

"অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী"-সম্পাদকের নিবেদন*

পদাবলী-সাহিত্যে অভিজ্ঞ, সুলেখক শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন মহাশয় আমার সম্পাদিত "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" নামক গ্রন্থে প্রকাশিত কতকগুলি প্রাচীন পদাবলী এবং ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় চণ্ডীদাস প্রভৃতি কয়েকজন প্রাচীন পদকর্ত্তার সম্বন্ধে আমি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি, উহার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ও গবেষণাপূর্ণ একটী প্রবন্ধ লিখিয়া, তৎপ্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এ জন্য আমি শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ বাবুকে এবং তাঁহার উক্ত প্রবন্ধটীর সম্বন্ধে আমার কি বক্তব্য আছে, জানার জন্য উহা আমার নিকট প্রেরণ করায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সাহিত্য-শাখার সুযোগ্য সদস্য মহাশয়-দিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

হরেকৃষ্ণ বাবুর প্রবন্ধের দফা অনুসারেই আমার বক্তব্য নিম্নে নিবেদন করিতেছি।

১। "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" গ্রন্থের ভূমিকার ৮/০—১।০ পৃষ্ঠায় বিদ্যাপতির পদাবলীর আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা দেখাইয়াছি যে, বাঙ্গালী পদকর্ত্তা কবিশেখর, বল্লভ, চম্পতি ও ভূপতিনাথের ভণিতাযুক্ত শতাধিক পদ বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ঐতিহাসিক ও ভাবগত প্রমাণের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, কেবল ভাষাগত সাদৃশ্য দর্শনেই বিদ্যাপতির পদ বলিয়া স্বীয় সংস্করণে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। হরেকৃষ্ণ বাবু তাঁহার এই প্রবন্ধে আমাদিগের ঐ উক্তির সমর্থন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার প্রথম দফার সম্বন্ধে আমাদিগের কিছু বক্তব্য নাই। তিনি প্রথম দফার শেষভাগে রাধাবল্লভের ভণিতাযুক্ত যে একটা নূতন ধরণের খণ্ডিত পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহাতে "আদ্যা", "যোগাদ্যা" ও "উলুকবাহন" কৃষ্ণের উল্লেখ দেখা যায়; সুতরাং পদটীতে ধর্ম্মপুরাণের প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রাচীন কোনও বৈষ্ণব-পদেই কিন্তু আমরা এরূপ উল্লেখ পাই নাই; এ জন্য এই পদের রচয়িতা রাধাবল্লভ, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা রাধাবল্লভ কি না, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ জন্মিয়াছে। (বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা রাধাবল্লভের ১৭টী পদ পদকল্পতরু গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। রাধাবল্লভের ঐ পদগুলির অধিকাংশই "ব্রজবুলী"র পদ, তিনি "ব্রজবুলী" পদরচনায় বেশ নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন।)

২। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়কর্ত্তৃক চণ্ডীদাসের রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নামক পুথিখানি আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হওয়ার পরে চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, এক আধটি প্রবন্ধে উহার উপযুক্ত বিস্তৃত আলোচনা করা অসম্ভব। লিপি-তত্ত্ব

---

* ১৩৩২।৩১শে জ্যৈষ্ঠ, প্রথম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

ও ভাষা-তত্ত্বের বিচারে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' পুথিখানির অসাধারণ প্রাচীনত্ব উত্তমরূপেই প্রমাণিত হইয়াছে। এ দিকে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত প্রচলিত বহু পদাবলীও 'পদামৃতসমুদ্র', 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি প্রাচীন পদ-সংগ্রহে দেখা যায়; সুতরাং সেগুলিকেও অন্ততঃ দুই শত বৎসরের কম প্রাচীন বলা যাইতে পারে না। এখন চণ্ডীদাস সম্বন্ধে প্রধান বিচার্য্য বিষয় তিনটী ;—

(১) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র রচয়িতা চণ্ডীদাসই প্রচলিত ও স্বর্গীয় নীলরতন বাবুর আবিষ্কৃত নূতন চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত পদাবলীর রচয়িতা চণ্ডীদাস কি না?

(২) একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় কি না?

(৩) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র রচয়িতা চণ্ডীদাস ও প্রচলিত পদাবলীর চণ্ডীদাস বিভিন্ন ব্যক্তি হইলে, ঐ বিভিন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত প্রসিদ্ধ পদাবলীর রচয়িতা বলিয়া কাহাকে স্বীকার করিতে হইবে?

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ বাবু তাঁহার বর্ত্তমান প্রবন্ধে কিংবা ১৩২৯ সনের পৌষ ও ১৩৩০ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় এই আলোচ্য বিষয়গুলির সম্বন্ধে যথারীতি সম্যক্‌রূপে আলোচনা করেন নাই। পরমত খণ্ডন ও স্বমত-সংস্থাপন—তর্কের এই দুইটী প্রধান ও প্রসিদ্ধ অঙ্গ বটে; তত্ত্বনির্দ্ধারণের জন্য এই দুইটীই একান্ত আবশ্যক। তার্কিকগণকে প্রায়শঃ প্রথমে পরমত খণ্ডনপূর্ব্বক পরে স্বমত সংস্থাপনে যত্নবান্‌ হইতে দেখা যায়। আমরা ১৩২৯ সালের চৈত্রসংখ্যার "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় হরেকৃষ্ণ বাবুর উত্থাপিত আপত্তিগুলির যথাসাধ্য সদুত্তর দিতে চেষ্টা করিয়া, যে জন্য প্রচলিত চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত পদাবলী আদি বৈষ্ণবকবি চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না, আমাদের সেই আপত্তিগুলির সংক্ষেপে উল্লেখ এবং হরেকৃষ্ণ বাবুকে উহার মীমাংসা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি তাঁহার পুনরালোচনায় আমাদিগের প্রদর্শিত আপত্তিগুলির রীতিমত আলোচনা না করিয়া, তাঁহার অনুকূল যুক্তিগুলিরই পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। এ ভাবে তর্ক চালাইয়া কোনও লাভ নাই মনে করিয়াই আমরা তাঁহার দ্বিতীয় প্রবন্ধের পুনরালোচনা করি নাই। অতঃপর তিনি ১৩৩১ সালের ভাদ্র সংখ্যার "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের উল্লিখিত "হা হা প্রাণপ্রিয় সখি কি না হৈল মোরে" ইত্যাদি চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পদটি প্রকাশিত করিয়া, ঐ পদের দ্বারাই তাঁহার সিদ্ধান্তের যথেষ্ট সমর্থন হইয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। চণ্ডীদাস সম্বন্ধে এ যাবৎ যতগুলি আলোচনা হইয়াছে, উহার সকলগুলির একত্র আলোচনা করিয়া আমরা পরিষৎ-পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত করার ইচ্ছা করিয়াছিলাম।* ঐ প্রবন্ধে হরেকৃষ্ণ বাবুর প্রদর্শিত এই চৈতন্য-চরিতামৃতের প্রমাণ সম্বন্ধেও আলোচনা করিব, মনে করিয়াই আমরা তৎসম্বন্ধে এ যাবৎ কোনও মন্তব্য প্রকাশ করি নাই; কিন্তু এখন হরেকৃষ্ণ বাবু বর্ত্তমান প্রবন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতের উক্ত পদটী পুনরায় উদ্ধৃত করিয়া, "চণ্ডীদাসের শ্রীমহাপ্রভুর আস্বাদিত গানই পরবর্ত্তী সংগ্রহগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে"—এইরূপ সিদ্ধান্ত করায়, আমাদিগকে সে সম্বন্ধেও দুই চারিটী কথা বলিতে হইবে।

অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের আলোচনার সুবিধার জন্য এ স্থলেই আমরা অতিসংক্ষেপে চণ্ডীদাস-সংক্রান্ত পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনাগুলির সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিয়া, মূল বিচার্য্য তিনটী বিষয়েরই মীমাংসার জন্য চেষ্টা করিব।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে যে, শ্রীমহাপ্রভু দামোদরস্বরূপ ও রায় রামানন্দের সহিত দিবারাত্র গীতগোবিন্দ, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী, রায় রামানন্দের নাটক ("জগন্নাথ-বল্লভ") ও পদাবলী এবং কৃষ্ণকর্ণামৃত (বিল্বমঙ্গল-কৃত) গ্রন্থের রসাস্বাদন করিতেন।* মহাপ্রভুর জন্মাবধি এ যাবৎ ৪৪০ বৎসর গত হইয়াছে; চণ্ডীদাস মহাপ্রভুরও আন্দাজ এক শতক পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন; সুতরাং মহাপ্রভুর সময় পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের পদাবলীর বিশেষ বিকৃতি ঘটে নাই এবং মহাপ্রভু চণ্ডীদাসের যে পদগুলি আস্বাদন করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিলে, সেগুলিকে বাঙ্গালার আদি বৈষ্ণব-কবি চণ্ডীদাসের খাঁটি পদ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, এ কথা সমীচীন বটে। সুতরাং মহাপ্রভুর সময়ে চণ্ডীদাসের কোন্ পদগুলি কি ভাবে প্রচলিত ছিল, চণ্ডীদাস-তত্ত্ব নির্দ্ধারণ বিষয়ে উহাও বিশেষ ভাবে আমাদের আলোচ্য।

প্রথমে হরেকৃষ্ণ বাবুর উল্লিখিত পদই ধরা যাউক। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য-লীলার ৩য় পরিচ্ছেদে আছে যে, সন্ন্যাসী অবস্থায় যখন শ্রীমহাপ্রভু শান্তিপুরে শ্রীমৎ অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে শুভাগমন করেন, তখন আচার্য্য প্রভু বিদ্যাপতির—"কি কহব রে সখি আনন্দ-ওর। চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পদটী গান করাইয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করেন। অতঃপর—

"প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভাল মতে।
ভাবের সদৃশ পদ লাগিল গাইতে॥
আচার্য্য উঠাইল প্রভুরে করিতে নর্ত্তন।
পদ শুনি প্রভুর অঙ্গ না যায় ধারণ॥
অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, গদ্‌গদ বচন।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণেকে রোদন॥
তথাহি পদম্
হা হা প্রাণপ্রিয় সখি কি না হৈল মোরে।"

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বহু প্রসিদ্ধ পদ সে সময়ে বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজে গীত হইত; সুতরাং চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণিত অবস্থায়, আচার্য্য প্রভু ও শ্রীমহাপ্রভু যে তাঁহাদিগের তৎকালীন

* চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥—চৈ-চ (মধ্য—২য় পরিচ্ছেদ)।

মনোভাবের ব্যঞ্জক বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের প্রসিদ্ধ পদ গাহিয়া নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করিবেন, ইহা নিতান্ত সম্ভবপর বটে; কিন্তু অদ্বৈত প্রভু আর শ্রীমহাপ্রভু যে ঠিক ঐ দুইটী পদই গান করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতের সাক্ষ্য কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, একটু ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, যথাসময়ে রোজ-নামচা লিখিয়া না রাখিলে আমরা আজ যে গানটি শুনিলাম, কয়েক বৎসর পরে শুধু স্মরণ করিয়া উহা বলা নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়ে। অদ্বৈত প্রভু কিংবা শ্রীমহাপ্রভু তৎসময়ে শান্তিপুরে ভাবাবেশে বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের যে পদটী গান করিয়াছিলেন, তাহা কোনও সাক্ষাৎ-শ্রোতা রোজনামচা করিয়া না রাখিলে, ঐ ঘটনার কয়েক বৎসর পরেই, ঐ গানের বিষয় সম্বন্ধে একটা মোটামুটি স্মৃতি ব্যতীত গানের ঠিক কথাগুলি সাক্ষাৎ-শ্রোতাদিগেরও স্মরণ থাকা সম্ভব বোধ হয় না। মহাপ্রভু চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন; এখানেই চৈতন্য-চরিতামৃতের বর্ণিত আদি-লীলার শেষ। তার পরে মধ্যলীলা,—

"তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল, গৌড়, সেতুবন্ধ বৃন্দাবন॥
তাহাঁ যেই লীলা তার মধ্য-লীলা নাম।
তার পাছে লীলা অন্ত্যলীলা অভিধান॥"—(চৈ-চ; মধ্য, ১ম পরিচ্ছেদ)

এই মধ্যলীলার শেষ সময়ে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনের পথ ভুলিয়া রাঢ়দেশে উপনীত হইলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রেমপূর্ণ কৌশলে তিনি শান্তিপুরে শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুর গৃহে সমানীত হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার আন্দাজ ত্রিশ বৎসর বয়সের কালে অর্থাৎ ১৪৩৭ শকে এই শান্তিপুর-মিলন সঙ্ঘটিত হয়। চৈতন্যচরিতামৃতের উপসংহার-শ্লোক ("শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে। সূর্য্যাহেঽসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥") হইতে জানা যায় যে, ১৫৩৭ শকে উক্ত গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়। অতএব বর্ণিত ঘটনার ঠিক একশত বৎসর পরে কবিরাজ গোস্বামী এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে উক্ত ঘটনার সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বিবরণের রোজনামচা-লেখক কোনও বিশ্বস্ত সাক্ষাৎ-দ্রষ্টার নিকট হইতে নিঃসন্দিগ্ধরূপে উল্লিখিত পদদ্বয়ের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন, এরূপ কোনও প্রমাণ নাই; সুতরাং তিনি যে কেবল তাঁহার সময়ের বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়াই ঐরূপ লিখিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণিত শ্রীমহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থূল ঘটনাবলীর মধ্যেও ঐতিহাসিক সমালোচক-দিগের অনুসন্ধানের ফলে আজকাল এত অসঙ্গতি ধরা পড়িয়াছে যে, চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ-খানাকে শ্রীমহাপ্রভুর জীবনের ও তাঁহার প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতের একটী উৎকৃষ্ট পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ ব্যতীত উহাকে নিঃসন্দিগ্ধ প্রামাণিক জীবন-বৃত্তান্ত বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। অতএব হরেকৃষ্ণ বাবুর প্রদর্শিত পদটীর দ্বারা শ্রীমহাপ্রভুকর্ত্তৃক উহা নিশ্চিতই আস্বাদিত হইয়াছিল, সুতরাং উহা চণ্ডীদাসের খাঁটি পদ, এরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে না;

ইহা দ্বারা বড় জোর এ পর্য্যন্ত বলা যায় যে, শ্রীমহাপ্রভুর জীবনের উক্ত ঘটনার প্রায় একশত বৎসর পরে, কবিরাজ গোস্বামীর বৃদ্ধাবস্থার সময়ে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত ঐ পদটী বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত ছিল। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, উল্লিখিত পদটী পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু, পদরসসার, পদরত্নাবলী, কীর্ত্তনানন্দ প্রভৃতি কোনও প্রসিদ্ধ পদ-সংগ্রহে কিংবা স্বর্গীয় রমণীবাবু বা নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে নাই। শ্রীমহাপ্রভুর দ্বারা সমাদৃত ও তৎকর্তৃক গীত হওয়ার অসামান্য সৌভাগ্য লাভ করা সত্ত্বেও উক্ত পদটী যে পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন পদসংগ্রহ পুথিগুলিতে স্থান পায় নাই, ইহা হইতেও যদি কেহ অন্ততঃ ঐ পদের নবাবিষ্কৃত কলি তিনটীর প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করেন, তাহা হইলে, এমন কি, কবিরাজ গোস্বামীর সময়েও সম্পূর্ণ পদটী এ ভাবে বর্ত্তমান ছিল কি না, তাহাও সন্দেহের বিষয় হইয়া পড়ে। আমাদের বিবেচনায় ১৫৩৭ শকে এই পদটী যথাযথ ভাবে বর্ত্তমান ছিল, ইহা তর্ক-স্থলে স্বীকার করিয়া লইলেও উহা দ্বারা বেশী কিছু আসে যায় না; বাশুলীভক্ত আদি বৈষ্ণব পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস প্রচলিত চণ্ডীদাস-ভণিতার পদাবলীর রচয়িতা নহেন, যদি ইহাই সমীচীন সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলেও চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত অতি উৎকৃষ্ট পদগুলির রচয়িতারা রাম্ শামুর মত নগণ্য লোক ছিলেন না, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ঐরূপ ভাবপূর্ণ পদ-রচনা কেবল গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রায়শেখর, বংশীবদন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তাদিগের পক্ষেই সম্ভব বটে। ইহারা প্রায় সকলেই শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্ত্তী শতকের লোক এবং কবিরাজ গোস্বামীর প্রায় সমসাময়িক; সুতরাং আদিকবি চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পদাবলী শ্রীমহাপ্রভুর বিশুদ্ধ ও পবিত্র বৈষ্ণব-মতাবলম্বী বঙ্গসমাজে ভাষা ও ভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন হেতু শ্রোতৃবর্গের দুর্ব্বোধ্য ও অপ্রীতিকর হইয়া পড়িলে যখন কীর্ত্তন-গায়কগণ শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জনের জন্য নিরুপায় হইয়াই তৎকালীন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তাদিগের কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদাবলী আত্মসাৎ করিয়া, চণ্ডীদাসের নাম দিয়া চালাইতে আরম্ভ করেন, তখন হইতেই চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত প্রচলিত পদাবলীর উদ্ভব হইতে থাকে। গোবিন্দদাস পরবর্ত্তী সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা হইলেও, তাঁহার অধিকাংশ উৎকৃষ্ট পদ ব্রজবুলীর রচনা বলিয়া, তাঁহার উপর কীর্ত্তন-গায়কদিগের বেশী দৌরাত্ম্য খাটে নাই। জ্ঞানদাস, রায়শেখর ও বংশীবদনের বাঙ্গালা পদগুলি ভাষার প্রাঞ্জলতা ও ভাবের গভীরতার জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া, তাঁহাদিগের উপরই অধিক অত্যাচার হইয়াছে। সে সময়ে সংবাদপত্রের প্রচার ছিল না; সুতরাং কখন কোন্ কীর্ত্তনিয়া তাঁহাদিগের কোন্ পদটীতে চণ্ডীদাসের ভণিতা যোগ করিয়া কোথায় গান করিল, যথাসময়ে জানিবার বা জানিয়া উহার প্রতিবাদ করার কোনও সুবিধা ছিল না; সুতরাং উক্ত পদকর্ত্তারা কিংবা তাঁহাদিগের শিষ্যগণ যে এ ক্ষেত্রে বৈষ্ণবোচিত উদারতাবশতঃ ঔদাসীন্যই প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের কারণ নাই। এরূপ স্থলে প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনিয়াদিগের ব্যবহার ও অনুকরণ-মূলে জ্ঞানদাস প্রভৃতির কতকগুলি পদ সকলের নিকট নির্ব্বিবাদে চণ্ডীদাসের বলিয়া প্রচলিত হইলেও, প্রাচীন

পদ-সংগ্রহের সঙ্কলয়িতা ও লিপিকারদিগের সত্যপ্রিয়তার জন্য কতকগুলি পদের ভণিতায় প্রকৃত পদকর্ত্তার নামই রহিয়া গিয়াছে, এবং উহার দ্বারাই এখন এই পরস্বাপহরণ-রহস্যের একটু ক্ষীণ আভাস পাওয়া যাইতেছে। প্রসিদ্ধ ভাগবত-টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ওরফে পদকর্ত্তা হরিবল্লভ ২৫০ শত বৎসরের প্রাচীন লোক; তাঁহার সঙ্কলিত "ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি" গ্রন্থে চণ্ডীদাস ভণিতার একটী পদও নাই। পদকর্ত্তা দীনবন্ধু দাসও অন্যূন দুই শত বৎসরের প্রাচীন লোক; বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক দীনবন্ধু দাসের সঙ্কলিত "সংকীর্ত্তনামৃত" নামক যে বৃহৎ পদ-সংগ্রহগ্রন্থ সম্পাদিত হইতেছে, উহাতেও চণ্ডীদাসের কোন পদ নাই; অথচ কিঞ্চিদধিক দেড় শত বৎসরের প্রাচীন "পদামৃতসমুদ্র" ও "পদকল্পতরু" প্রভৃতি গ্রন্থে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত প্রায় সকল উৎকৃষ্ট পদগুলিই পাওয়া যায়; ইহা দ্বারাও কি ইহাই অনুমিত হয় না যে, চণ্ডীদাসের 'পূর্ব্বরাগ' 'অনুরাগ' প্রভৃতি বিষয়ের অধিকাংশ প্রচলিত উৎকৃষ্ট পদাবলী ২০০ কি ২৫০ শত বৎসর পূর্ব্বে কীর্ত্তন-গায়ক-সমাজে অজ্ঞাত ছিল?

শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে চণ্ডীদাসের পদাবলী কি ভাবে প্রচলিত ছিল, আমরা মহাপ্রভুর সমসাময়িক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামীর প্রসিদ্ধ "বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী" টীকা হইতে উহার একটা সুন্দর আভাস পাইয়াছি। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৩৩শ অধ্যায়ের "এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশা" ইত্যাদি ২৬ সংখ্যক শ্লোকের "কাব্যকথা-শ্রয়ং" বাক্যের টীকায় লিখিয়াছেন,—"কাব্যশব্দেন পরমবৈচিত্রী তাসাং সূচিতাশ্চ গীত-গোবিন্দাদিপ্রসিদ্ধাস্তথা শ্রীচণ্ডীদাসাদিদর্শিতদানখণ্ডনৌকাখণ্ডাদিপ্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ।" ইহা দ্বারা নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে যে, আদি বৈষ্ণব পদকর্ত্তা চণ্ডীদাসের কাব্যে "দান-খণ্ড" ও "নৌকাখণ্ড"ই প্রধান বর্ণনীয় বিষয় ছিল। "পদামৃতসমুদ্র" ও "পদকল্পতরু"তে নানা পদকর্ত্তার দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের বহু পদ সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু উহাতে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত একটী পদও নাই;—ইহা দ্বারা কি নীলরতন বাবুর সংগৃহীত চণ্ডীদাসের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের ভাব-বৈচিত্র্যহীন পদাবলী আধুনিক ও অপর কোনও অপ্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া অনুমিত হয় না? শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের পদাবলী পদ-কল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহগ্রন্থে উদ্ধৃত না হওয়ার কারণ কিন্তু বুঝা কঠিন নহে। ভাষা ও ভাবের বৈষম্য হেতু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের খাঁটি পদাবলী বাঙ্গালার শ্রোতৃসমাজের অনুপযোগী এবং তজ্জন্য ক্রমে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথিখানির প্রচার বিলুপ্তপ্রায় হওয়ায়ই যে, উহার পদগুলি পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহে স্থান পায় নাই, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

এখন মূল আলোচ্য বিষয় তিনটী ধরা যাউক। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থের প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়া লইয়া, চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলী শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনরচয়িতা চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া স্বীকার করা যায় কি না, ইহাই প্রথম ও প্রধান আলোচ্য বটে। দুঃখের বিষয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সুবিজ্ঞ সম্পাদক বসন্ত বাবু তাঁহার সম্পাদকীয় বক্তব্যে এ

বিষয়ের রীতিমত আলোচনা করেন নাই। তথাপি তাঁহার সম্পাদকীয় বক্তব্যের নিম্নলিখিত অংশগুলি বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য,—"চণ্ডীদাস যে একাধারে কবি ও পণ্ডিত ছিলেন, পদাবলীর পাঠকমাত্রেই সে কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'তোর রতি আশোআসে,' 'যদি কিছু বোল বোলসি,' 'তনের উপর হারে,' 'নিন্দয়ে চান্দ চন্দন' প্রভৃতি পদ্ম জয়দেবের অনুকরণ; অনুকরণ হইলেও কবির অসাধারণ পাণ্ডিত্য সূচিত করে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে কিঞ্চিদধিক ১২৫টি সংস্কৃত কবিতা পাওয়া যায়। ওগুলি চণ্ডীদাসের স্বরচিত, গ্রন্থবিশেষ হইতে উদ্ধৃত নহে। 'চতুরে চতুরো মাসান্' কবিতাটিতে উত্তরমেঘের "মাসানেতান্ গময চতুরঃ" শ্লোকের সুর কানে বাজে। যাঁহারা পদাবলীতে উপমার অল্পতা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণকীর্ত্তনে উহার প্রয়োগবাহুল্য ও বিবিধ ছন্দের সমাবেশ দেখিয়া বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন কবির প্রথম বয়সের রচনা মনে করা যাইতে পারে।" (সম্পাদকীয় বক্তব্য, ২৫-২৬ পৃষ্ঠা)।

"চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত 'রাধার কলঙ্কভঞ্জন' ও 'কৃষ্ণের জন্মলীলা' নামক পুথির কথা সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ দুইটিতে প্রসিদ্ধ কবি চণ্ডীদাসের কবিতার কোন লক্ষণই আমরা দেখিতে পাই নাই।"—(ঐ ২৬ পৃষ্ঠা)। "কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা ও বিদ্যাপতি, মাধব কন্দলি, শঙ্করদেব, জগন্নাথ দাস প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক কবিগণের ভাষাতে সাদৃশ্য আছে। গুণরাজ খান, বৃন্দাবন দাস, লোচন দাসের ভাষাতেও কিছু কিছু আছে। প্রমাণ হস্তলিখিত সুপ্রাচীন পুথিতে প্রাপ্তব্য। 'বঁধু কি আর বলিব আমি' পদের ভাষা অত্যন্ত আধুনিক—একেবারে হালী। উহা বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে আদৌ খাপ খায় না। সুতরাং কোন ক্রমেই চণ্ডীদাসের ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।"—(ঐ, ৩৫ পৃষ্ঠা)।

"পাঠকগণ কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'দেখিলোঁ প্রথম নিশি' পদের ভাষার সহিত পদাবলীর 'প্রথম প্রহর নিশি' পদের ভাষা তুলনা করিয়া দেখিবেন, চণ্ডীদাসের ভাষা কিরূপভাবে বিকৃত বা রূপান্তরিত হইয়াছে।"—(ঐ, ৩৫।৩৬ পৃষ্ঠা)।

বসন্তবাবুর প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে অভিজ্ঞতা ও তাঁহার ভাষাতত্ত্বজ্ঞানের উপর আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকিলেও আমরা বিনীতভাবে বলিতে বাধ্য যে, 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' গ্রন্থখানি কবি চণ্ডীদাসের প্রথম বয়সের রচনা আর পদাবলী তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা, বসন্তবাবুর এই উক্তির কোন মতেই সমর্থন করিতে পারি না। কালিদাস, সেক্সপীয়র প্রভৃতি জগতের শ্রেষ্ঠ মহাকবিদিগেরও প্রথম বয়স ও পরিণত বয়সের রচনায় যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও "ঋতুসংহার" কাব্য কিংবা "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটক যে রঘুবংশ শকুন্তলাকার কালিদাসের ব্যতীত অন্য কোন সংস্কৃত কবির রচনা নহে—তাহা বুঝিতে বিশেষজ্ঞগণের পক্ষে কোনও বাধা হয় না। কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তন ও চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলীর সম্বন্ধে কি সে কথা বলা যাইতে পারে? কৃষ্ণকীর্ত্তনের "দেখিলোঁ প্রথম নিশি" ইত্যাদি শুধু একটীমাত্র পদ নীলরতন বাবুর সংস্করণের "প্রথম প্রহর নিশি" ইত্যাদি পদে যেরূপ

রূপান্তরিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে বহুগুণে অধিক রূপান্তরিত-ভাবেও আর কোনও পদ পাওয়া গিয়াছে কি? ভাষা বিচারের একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য অবলম্বন বসন্তবাবুর অনুসৃত পারিপার্শ্বিক প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির ভাষার সাহায্যে আলোচনা করিলে কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার সহিত পদাবলীর "সই কেবা শুনাইলে শ্যামনাম", "বঁধু কি আর বলিব আমি," "আজি কেগো মুরলী বাজায়" ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ পদাবলীর ভাষার ব্যবধান অন্ততঃ তিন শতাব্দীর কম বলিয়া মনে করা যায় না। উভয়ের মধ্যে ভাবগত ও রস-গত পার্থক্য যে আরও কত বেশী, তাহা বলা আরও কঠিন। কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থখানা যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়া, আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, উহার কবি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, অসাধারণ রসজ্ঞ এবং বাঙ্গালার আদি ও শ্রেষ্ঠ গীতি-নাট্যের রচয়িতা হইলেও প্রেমাবতার শ্রীমহাপ্রভুর অনর্পিতচর প্রেমধর্ম্ম-প্রচার সঙ্ঘটিত হওয়ার পূর্ব্বে চণ্ডীদাসের পক্ষে তাঁহার নামে প্রচারিত অনন্যসাধারণ ভাব ও প্রেমের পরাকাষ্ঠাপূর্ণ পদাবলী রচনা করা কখনও সম্ভবপর হইত না।

চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলীতে আমরা পূর্ব্বরাগ, রূপানুরাগ, অভিসারানুরাগ, আক্ষেপানুরাগ প্রভৃতি যে রসের ধারা দেখিতে পাই, উহা "উজ্জ্বল-নীলমণি" প্রভৃতি শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্ত্তী রস-শাস্ত্রেরই নিজস্ব। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী "গীতগোবিন্দ", "কৃষ্ণকীর্ত্তন" বা বিদ্যাপতির পদাবলীতে আমরা তাহা দেখিতে পাই না; পাওয়ারও কথা নহে। আমরা প্রচলিত পদাবলী-সাহিত্যে যে অনন্যসাধারণ ভাব ও প্রেমের উৎকর্ষ দেখিতে পাই, শ্রীমহাপ্রভু স্বীয় অলৌকিক চরিত্র দ্বারা উহার স্বাভাবিকতা প্রতিষ্ঠিত না করিলে অসাধারণ প্রতিভাশালী বৈষ্ণব কবিগণের পক্ষেও তাহা এরূপ সহজ ও সুন্দররূপে চিত্রিত করা সম্ভব হইত না। হরেকৃষ্ণ বাবুর ন্যায় পদাবলীভক্ত সুধী ব্যক্তিও কেন যে, শ্রীমহাপ্রভুর প্রেমময় জীবন ও তাঁহার প্রেমধর্ম্ম-প্রচারের এই অনন্যসাধারণ মাহাত্ম্যটা লক্ষ্য না করিয়া, তাঁহার জন্মের অন্যূন একশতাব্দী পূর্ব্বের অনুর্ব্বর কণ্টকাকীর্ণ বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে 'বসোরা' গোলাপের তুল্য অতুলনীয় বৈষ্ণবপদাবলীর উৎপত্তি সম্ভবপর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থখানা যে কবির অপরিণত বয়সের রচনা নহে এবং কৃষ্ণকীর্ত্তনের বর্ণিত কথাবস্তু ও রসের ধারার সহিত পদাবলীর বর্ণিত লীলা ও রস-পর্য্যায়ের কিরূপ মৌলিক পার্থক্য, আমরা ১৩২৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে উহা সবিস্তারে প্রদর্শিত করিয়াছি। আমরা অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গকে ঐ প্রবন্ধ ও তৎসঙ্গে আমাদের "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী"র ভূমিকার ১৸৵০—১৸৵০ পৃষ্ঠা ও ১৩২৯ সালের চৈত্র সংখ্যার "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় "চণ্ডীদাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার উত্তর" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমরা এখানে ঐ আলোচিত বিষয়ের অনাবশ্যক পুনরালোচনা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না।

একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার্য্য কি না, এই দ্বিতীয় বিচার্য্য সম্বন্ধে আমাদের

বক্তব্য এই যে, চণ্ডীদাস-রচিত "কলঙ্কভঞ্জন" ও "শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা" প্রবন্ধ দুইখানা পাঠ করিলে, উহাদের রচয়িতা চণ্ডীদাস যে পদাবলীর রচয়িতা চণ্ডীদাস নহেন, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা চণ্ডীদাস, পদাবলীর রচয়িতা চণ্ডীদাস হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি, স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় তাঁহার 'চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা" (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ২১শ ভাগ, ১ম সংখ্যা) প্রবন্ধেও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরাও তাঁহার ঐ মতের সমর্থন করি। চণ্ডীদাসের একটী রাগাত্মিক পদে ভণিতা আছে,—"আদি চণ্ডীদাস বিধেয় কয়।"—(রমণীবাবুর ৩য় সংস্করণ, ৪৮৮ পৃষ্ঠা)। ইহা দ্বারাও একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। অনেক সুধী ব্যক্তি "চণ্ডীদাস" নামটী "জগৎশেঠ" বা "জগৎগুরু—শঙ্করাচার্য্য" নামের মত কৌলিক উপাধির সূচক বলিয়া মনে করেন; বস্তুতঃ অতদূর না যাইতে পারিলেও অনেক নগণ্য ও নিকৃষ্ট পদে ও পয়ারে আমরা সুপ্রসিদ্ধ "বড়ু চণ্ডীদাস" নামের পরিবর্ত্তে "দ্বিজ চণ্ডীদাস" ও "দীন চণ্ডীদাস" ভণিতা পাইয়া—এই দীন বা দ্বিজ চণ্ডীদাস যিনি বা যাঁহারাই হউন না কেন, তিনি বা তাঁহারা মহাকবি বড়ু চণ্ডীদাস হইতে স্বতন্ত্র, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু এরূপ একাধিক চণ্ডীদাস স্বীকার করিলেই মূল বিচার্য্য বিষয়ের মীমাংসা হয় না। এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, কৃষ্ণকীর্ত্তনের রচয়িতা, সুপণ্ডিত ও শ্রেষ্ঠ গীতিনাট্য-রচয়িতা চণ্ডীদাস ও অতুলনীয় গীতি কাব্য বৈষ্ণব-পদাবলীর রচয়িতা কবিশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাস যদি বিভিন্ন ব্যক্তিই হইবেন, তবে শেষোক্ত চণ্ডীদাস কখন, কোন্ দেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন? শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্ত্তী সময়ের সাহিত্য ও সমাজের বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক বিবরণ অপ্রাপ্য নহে। তৎসময় এরূপ অদ্বিতীয় বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা কোনও চণ্ডীদাসের আবির্ভাব হইয়া থাকিলে—বৈষ্ণব-সাহিত্যে ঘুণাক্ষরেও তাঁহার উল্লেখ নাই কেন? এই সঙ্গত ও অখণ্ডনীয় আপত্তির মীমাংসার জন্য শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস শ্রীমহাপ্রভুর কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ও পদাবলীর চণ্ডীদাস তাঁহার আন্দাজ এক শতাব্দী পরে জন্মিয়াছেন—এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার একটী প্রবন্ধে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৯ সালের চতুর্থ সংখ্যা) কৃষ্ণকীর্ত্তনরচয়িতা আদি চণ্ডীদাসকে ১২শ শতকের "গীতগোবিন্দ"রচয়িতা জয়দেবেরও পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। পদাবলীর চণ্ডীদাসের সময় সম্বন্ধে তিনি কোনও কথা বলেন নাই। এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, তিনি শ্রীমহাপ্রভুর আন্দাজ এক শতাব্দী পূর্ব্বের চণ্ডীদাস কি না? যদি হরেকৃষ্ণবাবুর মত তাহাই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সেইরূপ অনুমানের বিরুদ্ধে আমরা ভাষাগত ও ভাবগত যে সকল অনৈক্য ও অসঙ্গতি প্রদর্শিত করিয়াছি, উহার কোনই মীমাংসা হয় না। চণ্ডীদাসকে মহাপ্রভুর এক আধ শতাব্দী পরবর্ত্তী বলিয়া ধরিয়া লইলে ঐ ভাষাগত ও ভাবগত আপত্তির খণ্ডন হইতে পারে, কিন্তু তাহা স্পষ্টতঃ ঐতিহাসিক প্রমাণ-বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং একাধিক অপ্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসেরঅস্তিত্ব স্বীকার করিলেও মহাকবি চণ্ডীদাস যে একজন ব্যতীত দুইজন নহেন, ইহা অস্বীকার করার

উপায় নাই। এ অবস্থায় উপযুক্ত প্রমাণাভাবে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত মত গ্রহণ করিতে না পারিয়া, আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তনরচয়িতা চণ্ডীদাসকেই শ্রীমহাপ্রভুর আন্দাজ এক শতাব্দী পূর্ব্বের লোক এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদাবলীই তাঁহার খাঁটি রচনা, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতেই বাধ্য হইয়াছি। এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, আমরাই এই অভিনব মতের প্রথম প্রচারক নহি। আমরা পরিষৎ-পত্রিকায় "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত করার আন্দাজ দুই বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গগত মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ মুখবন্ধে আমাদের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন ; আমরা তাহার কয়েক পঙ্‌ক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"একই চণ্ডীদাস কখনও এই দুই রকমের ভাষায় কথা কহিতে পারেন না। তবে কি আমাদের চিরপরিচিত চণ্ডীদাস আর এই নবাবিষ্কৃত চণ্ডীদাস এক চণ্ডীদাস নহেন? দুইজন বড়ু চণ্ডীদাস, বাশুলীর আদেশে গান রচনায় নিপুণ, রামী রজকিনীর বঁধু। তাহা ত হইতে পারে না। একজন তবে কি আসল, আর একজন নকল? কে আসল? কে নকল? ইত্যাদি নানা সমস্যা, নানা প্রশ্ন বাঙ্গালা সাহিত্যে উপস্থিত হইবে। সেই সকল সমস্যার মীমাংসায় আমার অধিকার নাই। বসন্ত বাবু মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন। আমার মতে— কৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাসই যে খাঁটি, তাহা অস্বীকারের হেতু নাই।"

হরেকৃষ্ণবাবু দেখাইয়াছেন যে, আমরা চণ্ডীদাসের অনেক গানে অন্য কবির ভণিতা দেখিয়া, উহা প্রকৃতপক্ষে কাহার পদ, সে সম্বন্ধে কোন বিচার-বিতর্ক না করিয়াই সেগুলি অন্যান্য কবির নামে পদরত্নাবলীতে প্রকাশিত করিয়াছি। বস্তুতই "পদরসসার," "পদ-রত্নাকর" প্রভৃতি পুঁথিতে কতকগুলি পদে এরূপ ভণিতার বিপর্য্যয় দেখা যায়। ঠিক্ ঐ পদগুলিই রমণীবাবু কিংবা নীলরতন বাবুর সংস্করণে অবিকল ভাবে চণ্ডীদাসের নামে উদ্ধৃত হইয়াছে কি না, তৎসময় আমরা উহা লক্ষ্য করি নাই। আমাদের নীলরতন বাবুর সংস্করণটী অপহৃত হওয়ায় এবং উহা এখন অপ্রাপ্য হওয়ায় সময়াভাবে আমরা এখন ঐ সংস্করণটী সংগ্রহ করিয়া মিলাইয়া দেখিতে পাইলাম না। ঐ পদগুলি অবিকলভাবে চণ্ডীদাসের পদাবলীতে প্রকাশিত হইয়াছে বুঝিতে পারিলে নিশ্চিতই আমরা উহা অপ্রকাশিত পদাবলীর মধ্যে সন্নিবেশিত করিতাম না; কিন্তু এইরূপ ভণিতার বিপর্য্যয় হইতেই পরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-কবিদিগের কতকগুলি প্রসিদ্ধ পদ যে, কীর্ত্তনিয়াগণকর্ত্তৃক কিরূপে চণ্ডীদাসের নামে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় বলিয়া, আমরা উহা আমাদের পূর্ব্বোক্ত অনুমানের পোষক প্রমাণস্বরূপ ভূমিকায় অবশ্যই উল্লেখ করিতাম। যাহা হউক, হরেকৃষ্ণবাবু এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। অন্য কোন্ কোন্ পদকর্ত্তার কোন্ কোন্ এবং কতগুলি পদে এভাবে চণ্ডীদাসের ভণিতা-সংযোগ ঘটিয়াছে —চণ্ডীদাস-সমস্যার সুমীমাংসার জন্য উহা বিশেষভাবে আলোচ্য বটে। আমরা ভবিষ্যতে স্বতন্ত্র একটা প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য ইচ্ছুক রহিলাম। ভরসা করি, হরেকৃষ্ণ

বাবুও তাঁহার সংগৃহীত প্রাচীন পুথিগুলির সাহায্যে এই কৌতূহলজনক নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়টীর উপরে আরও নূতন আলোক বিকীর্ণ করিতে সচেষ্ট হইবেন। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলী আসল নহে, উহা নকল—ইহা বলা যত সহজ,—কিরূপে, কখন ও কাহার দ্বারা ঐ নকল পদাবলী রচিত ও প্রচারিত হইল, তাহা বলা সেরূপ সহজ নহে। যদি পদকর্ত্তারা সকলেই স্বরচিত পদাবলীর স্বহস্ত-লিখিত সন-তারিখযুক্ত লিপি রাখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে এখন সেই লিপিগুলির তুলনা করিয়া পদাবলীর পৌর্ব্বাপর্য্য ও কৃতিত্ব অনেকটা নিরূপিত হইতে পারিত। পদকর্ত্তারা সেরূপ করেন নাই; কাজেই এখন এই বিষযটা ঘোর অন্ধতমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সমসাময়িক একদেশীয় একই সম্প্রদায়ভুক্ত পদকর্ত্তাদিগের পদাবলীর ভাষা কিংবা ভাব দর্শনে পৌর্ব্বাপর্য্য স্থির করা একরূপ অসম্ভব। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিদিগের ভাষা ও ভাবের মধ্যেও অনেক স্থলেই এরূপ আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায় যে, অনেক সময়ে তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদগুলির মধ্যে কোন্‌টী কাহার রচনা, চিনিয়া লওয়া বিশেষজ্ঞদিগের পক্ষেও অসম্ভব বোধ হয়। অভিজ্ঞ পদাবলীপাঠক মাত্রেই জানেন যে, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রায়শেখর, লোচনদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তাদিগের প্রত্যেকেরই দশ পাঁচটী করিয়া এরূপ উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদ আছে—যাহা ভাষা কিম্বা ভাবে চণ্ডীদাস-ভণিতার উৎকৃষ্ট পদাবলীর সহিত তুলনার অযোগ্য নহে। পক্ষান্তরে চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত উত্তম, মধ্যম ও অধম—তিন রকমের আট নয় শত পদের মধ্যে উৎকৃষ্ট পদাবলীর সংখ্যা চল্লিশ পঞ্চাশটীর বেশী হইবে না, সুতরাং চণ্ডীদাসের নামে নকল, কিন্তু উৎকৃষ্ট পদাবলী প্রচারিত হওয়া বিষয়টা আপাততঃ যেরূপ অসম্ভব বা দুর্ব্বোধ্য মনে হয়, একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে সেরূপ মনে হইবে না।

৩। হরেকৃষ্ণ বাবুর ৩ দফার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, চন্দ্রশেখর ও শশিশেখরের কয়েকটা বিচিত্র পদ পূর্ব্ব-প্রকাশিত হইলেও পাঠ-বিভ্রাট ও ছন্দের বিপর্য্যয় হেতু সেগুলির সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হওয়ায়, আমরা জানিয়া শুনিয়াই পদরত্নাবলীতে সেগুলির যথাসম্ভব শুদ্ধ পাঠান্তর, ছন্দের মাত্রা-বিশ্লেষণ সহ প্রকাশিত করিয়াছি এবং ভূমিকায়ও তাহার উল্লেখ করিয়াছি। হরেকৃষ্ণ বাবু "রাধে জয় রাজপুত্রি" ইত্যাদি পদ যে বদনের নহে, এ বিষয়ে কোনই প্রমাণ দিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার সম্পূর্ণ আনুমানিক মন্তব্যের প্রতিবাদ করা অনাবশ্যক।

৪। হরেকৃষ্ণ বাবু আমাদিগের অপ্রাপ্ত যদুনাথ দাসের "সুবল-মিলন" লীলার পদগুলি পাইয়াছেন জানিয়া সুখী হইয়াছি। তিনি উহার একটা পদ দিয়াছেন। আশা করি, বাকি পদগুলিও প্রকাশ করিয়া যদুনাথের অসম্পূর্ণ পালাটী পূর্ণ করিবেন।

৫। দফার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, "জলে" শব্দের সহিত "তলে" শব্দেরই ভাল মিল হয়। সুতরাং প্রথম চরণের "সই কেন গেলাম যমুনার জলে" পাঠই ছন্দের হিসাবে নির্দ্দোষ বটে। আমরা এই নির্দ্দোষ পাঠান্তরটা না পাওয়ায়ই যথাপ্রাপ্ত পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। তথাপি এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, হরেকৃষ্ণ বাবুর প্রাপ্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণের—

"নন্দের নন্দন চাঁদ পাতিয়া মোহন ফাঁদ
ব্যাধ ছলে কদম্বের তলে॥"

পাঠ অপেক্ষা আমাদের প্রাপ্ত—

"নন্দের দুলাল চাঁদ পাতিয়া মোহন ফাঁদ
ব্যাধ ছিল কদম্বের তলে॥"

পাঠই সমীচীন মনে হয়। "ব্যাধ ছলে" পাঠ স্বীকার করিলে, উক্ত পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে রূপকের পরিবর্ত্তে অপহ্নুতি অলঙ্কার ঘটিয়া থাকে। অপহ্নুতি অলঙ্কারের স্থলে সর্ব্বত্রই উপমেয় বা প্রকৃত বস্তুটীর পরে উহার 'অপহ্নব' অর্থাৎ সঙ্গোপনসূচক "ছলে" ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ দ্বারা উপমেয়ের সঙ্গোপনপূর্ব্বক উপমান বা অপ্রকৃত বস্তুটীরই সত্তা প্রখ্যাপিত করা হইয়া থাকে। এখানে নন্দের দুলাল বা নন্দনই উপমেয় বা প্রকৃত বর্ণনীয় বিষয়,—ব্যাধ উপমান বা অপ্রকৃত বিষয়। কবি এখানে শ্রীকৃষ্ণের মধুর লাস্য-লীলারূপ প্রকৃত বিষয়টী সঙ্গোপিত রাখিয়া উহাকে অপ্রকৃত ব্যাধের মৃগ-পক্ষী ধরার মোহন-ফাঁদরূপে প্রখ্যাপিত করিয়াছেন; সুতরাং "ব্যাধের ছলে নন্দ-নন্দন ফাঁদ পাতিয়া ছিল" এইরূপ অসঙ্গত কথা না বলিয়া, "নন্দনন্দনের ছলে ব্যাধ ফাঁদ পাতিয়া ছিল"—ইহা বলাই একান্ত আবশ্যক ছিল; সেরূপ না বলায়, উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে রূপক অলঙ্কারই কবির অভিপ্রেত, সুতরাং 'ছিল' ছাড়া 'ছলে' পাঠ হইতে পারে না, ইহা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে।

হরেকৃষ্ণ বাবু দানলীলায় "এই মনে বনে দানী হইয়াছ" ইত্যাদি গোবিন্দদাসের যে পদটী (পদকল্পতরুর তৃতীয় শাখার ২৫শ পল্লবের ৩০ সংখ্যক পদ) উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই পদের সহিত পদরত্নাবলীর ৩৬৯ সংখ্যক বংশীবদনের পদের কেবল একটী কলি (ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ইত্যাদি,) অভিন্ন,—তা ছাড়া বাকী কলিগুলির মধ্যে কিছুমাত্র ঐক্য নাই। এই পদকর্ত্তা বংশীবদন গোবিন্দ কবিরাজেরও অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী, তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত "গৌরপদতরঙ্গিণী" গ্রন্থের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। গোবিন্দদাসের "এই মনে বনে" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত পদের ও বংশী-বদনের "ছুইয় না ছুইয় না" ইত্যাদি পদের মধ্যে যে কলিটা অভিন্ন, তাহা বংশীবদন গোবিন্দদাসের পদ হইতে লইয়াছেন, এরূপ অনুমান অসম্ভব। গোবিন্দদাসের মত বিখ্যাত কবিই বা অন্যের পদের একটা কলি আত্মসাৎ করিতে যাইবেন কেন? কীর্ত্তনগায়ক বা পদের লিপিকার দিগের ভ্রম-প্রমাদ হেতুই একটা কলি এ ভাবে মিশিয়া গিয়াছে—ইহাই একমাত্র সমীচীন অনুমান বটে। হরেকৃষ্ণ বাবুর উদ্ধৃত গোবিন্দদাসের "তোঁহারি হৃদয় বেণি বদরিকাশ্রম" ইত্যাদি প্রত্যুত্তরের পদটীও পদকল্পতরুতে "এই মনে বনে" ইত্যাদি পদের অব্যবহিত পরেই সন্নিবেশিত দেখা যায়। গোবিন্দদাসের এই দুইটী পদের প্রামাণিকতা আমরা অস্বীকার করি না। হরেকৃষ্ণ বাবু বংশীবদনের পূর্ব্বোক্ত ত্রিপদীর পদটীতে একটীমাত্র কলির ঐক্য দেখিয়া, ঐ সম্পূর্ণ পদটী কেন অগ্রাহ্য করিয়াছেন, বুঝিতে পারিলাম না।

হরেকৃষ্ণবাবু বংশীবদনের পদে যে লঘুত্রিপদী ও দীর্ঘত্রিপদী ছন্দের গোলযোগের কথা

লিখিয়াছেন, প্রাচীন অনেক পদকর্ত্তার একাধিক পদে আমরা এরূপ ছন্দের উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় পাইয়াছি, ইহা দ্বারা ঐ সকল পদের কৃত্রিমতা ও আধুনিকতা প্রমাণিত না হইয়া বরং সেগুলির অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতাই প্রমাণিত হয়।

৬। চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক উৎকলবাসী ভক্ত কানাই খুঁটিয়ার বিষয় উল্লিখিত আছে; কিন্তু তিনিই পদরত্নাবলীর ৪৩৪ সংখ্যক "মনচোরার বাঁশী বাজিও ধীরে ধীরে" ইত্যাদি বাঙ্গালা পদের রচয়িতা কানাই খুঁটিয়া কি না, সে সম্বন্ধে এ যাবৎ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এ জন্যই আমরা পদরত্নাবলীর ভূমিকায় কানাই খুঁটিয়ার সম্বন্ধে বৈষ্ণবসাহিত্যানুরাগীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। কেবল নাম-সাদৃশ্য দর্শনে উৎকলবাসী কানাইকে বাঙ্গালা-পদকর্ত্তা বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে না। আশা করি, ওড়িয়া সাহিত্যে সুপণ্ডিত কোনও বাঙ্গালী সাহিত্যসেবী এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া, পদাবলী-সাহিত্যের ইতিহাসের একটা সমস্যা পূরণের চেষ্টা করিবেন। উৎকল-সাহিত্যে কানাই খুঁটিয়ার অনুসন্ধান করিবার সময় রাধামোহন ঠাকুরের কৃত "পদামৃতসমুদ্রে"র সংস্কৃত টীকায় উল্লিখিত রাজা প্রতাপরুদ্রের ভূতপূর্ব্ব মহাপাত্র "রায় চম্পতি" নামক প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তার সম্বন্ধেও বিশেষ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। চম্পতির রচিত ব্রজবুলী ও বাঙ্গালা—উভয়বিধ পদই পদকল্পতরুতে পাওয়া গিয়াছে। এ দিকে আবার তাঁহার ব্রজবুলীর পদগুলি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় "চম্পতি" বিদ্যাপতিরই একটা উপাধি মনে করিয়া, তাঁহার বিদ্যাপতির পদাবলীতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। চম্পতির "অখিল-লোচন তম তাপ-বিমোচন" (প-ক-ত,৪৮০ সং), "সখি হে কাহে কহসি কটুভাষা (প-ক-ত, ৮৮১ সং) ইত্যাদি ব্রজবুলীর পদগুলি অতি প্রসিদ্ধ।

হরেকৃষ্ণবাবু মাধব ও দ্বিজ পরশুরামের রচিত "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল", "মাধবী" ভণিতাযুক্ত "রস-পুষ্টি-মনোশিক্ষা" ও নটবরের কৃত পাণ্ডবগীতার অনুবাদ পুথিগুলির সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন জানিয়া আনন্দিত হইলাম। ভরসা করি, তিনি সময়ান্তরে পরিষৎ-পত্রিকায় ঐ পুথিগুলির একটু বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত করিয়া আমাদিগের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবেন।

৭। হরেকৃষ্ণবাবুর ৭ দফা সম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নাই।

৮। হরেকৃষ্ণবাবু পদরত্নাবলীর উল্লিখিত ও প্রকাশিত অজ্ঞাতপূর্ব্ব ২৮ জন পদকর্ত্তার মধ্যে "কাশীদাস", "বীরবাহু", "রাজচন্দ্র" ও "ভাগবতানন্দের" পদগুলি "পদকল্পলতিকা" গ্রন্থে অবিকল উদ্ধৃত দেখিতে পাইয়াছেন। পদরত্নাবলী প্রকাশিত হওয়ার পরে আমরাও উহা লক্ষ্য করিয়াছি। আমাদিগের অপ্রণিধানবশতঃই ঐ পদগুলি পদরত্নাবলীতে পুনরুদ্ধৃত হইয়াছে। তবে পদরত্নাবলীর ও পদকল্পলতিকার ঐ পদগুলির মধ্যে দুই একটা কলির কম-বেশও দেখিতে পাওয়া যায়। পদগুলি পদরত্নাবলীতে দেওয়ায় বোধ হয়, পাঠ-বৈষম্যের বিচারের পক্ষে সুবিধাই হইবে।

৯-১০। হরেকৃষ্ণবাবুর ৯ ও ১০ দফার সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই।

১১। হরেকৃষ্ণবাবুর ১১ দফার সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। 'তুক' বা 'তুক্কো' শব্দের ব্যুৎপত্তি কি? হরেকৃষ্ণবাবু পদাবলীর আদি জন্মভূমি বীরভূমের অধিবাসী। বীরভূম অঞ্চলে যত প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনগায়ক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয়, আর কোথায়ও নহে। "তুক্কো" গানগুলি রীতিমত পদ না হইলেও প্রায়ই খুব প্রাচীন এবং ভাষা, ভাব ও রসের হিসাবে অতি উপাদেয়। সেগুলি সযত্নে সংগৃহীত হওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। ভরসা করি, হরেকৃষ্ণবাবু রাঢ় দেশের প্রচলিত "তুক্কো"গানগুলি সংগৃহীত ও প্রকাশিত করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের একটা চিরস্মরণীয় উপকার করিবেন।

১২। হরেকৃষ্ণ বাবু ১২ দফায় অনেকগুলি অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদকর্ত্তার একটা তালিকা দিয়া এ সম্বন্ধে গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন এবং তজ্জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নিকট পদকল্পতরুর পদসূচী ও পদকর্ত্তৃগণের সূচী প্রস্তুত না থাকাতেই বোধ হয়, তাঁহার তালিকায় কয়েকজন পূর্ব্ব-পরিচিত পদকর্ত্তার নামও লিখিত হইয়াছে। তালিকায় জগদানন্দ ঠাকুর ও নয়নানন্দ ঠাকুরের নাম কেন দেওয়া হইয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না; ইঁহারা সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা এবং ইঁহাদের বহু উৎকৃষ্ট পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তবে অবশ্যই একাধিক জগদানন্দ ও নয়নানন্দ থাকা অসম্ভব নহে। হরেকৃষ্ণ বাবুর এই জগদানন্দ ও নয়নানন্দ যে নূতন পদকর্ত্তা, তাহার কোনও প্রমাণ আছে কি? তালিকার গোকুলানন্দ নাম নূতন নহে। গোকুলানন্দের একটী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। (প-ক-ত, ২৩৫১ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য)। পদকল্পতরুতে "কৃষ্ণকান্ত", "গোপীকান্ত" ও "রামকান্ত"—তিনজন কান্তেরই পদ আছে। সম্পূর্ণ নামের পরিবর্ত্তে সুবিধার জন্য নামের একাংশ গ্রহণের রীতি এ দেশে পূর্ব্বাবধি চলিয়া আসিতেছে। পদকল্পতরুতে এরূপ নাম-সংক্ষেপের অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। বিশেষ প্রমাণের অভাবে এরূপ স্থলে শুধু 'কান্ত' 'দাস' ভণিতা দেখিয়াই নূতন পদকর্ত্তার অস্তিত্ব স্থির করা সঙ্গত হইবে না।

হরেকৃষ্ণবাবুর "যাদবেন্দ" পদকল্পতরুর পরিচিত পদকর্ত্তা "যাদবেন্দ্র" বলিয়াই সন্দেহ হইতেছে। পদকল্পতরুতে "হরিদাস" (২৩৪২।৩০১৪ পদের রচয়িতা) ও "দ্বিজ হরিদাস" (১২৯।২৯৮।১৪৬৮।১৪৬৯ পদের রচয়িতা) ভণিতার পদ আছে। হরেকৃষ্ণ বাবুর "হরিদাস" যে ভিন্ন ব্যক্তি, তাহার কি প্রমাণ আছে? অবশিষ্ট নামগুলির মধ্যেও 'ভবানীদাস' বঙ্গসাহিত্যে অপরিচিত নহেন; তবে সেই ভবানীদাস ও এই ভবানীদাস এক কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে। যাহা হউক, এইরূপ কয়েকটী নামের সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও তিনি যে তাঁহার প্রদর্শিত তালিকার বত্রিশ জন পদকর্ত্তার মধ্যে অন্ততঃ ছাব্বিশ জন অজ্ঞাত পদকর্ত্তার ভণিতাযুক্ত পদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, এ জন্য আমরা তাঁহাকে সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি। আশা করি, হরেকৃষ্ণবাবু ইহাঁদিগের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত করিয়া পদাবলী-সাহিত্যের ইতিহাসের পুষ্টি-সাধন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

'অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী'র উপর মন্তব্য সম্বন্ধে বক্তব্য

শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রবন্ধটি পড়িয়া এবং তৎসম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। কিন্তু এই মন্তব্যে তিনি এত পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন যে, তাহার উত্তর দিতে হইলে, আমাকে আবার সেই "ভারতবর্ষ" প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত বাদপ্রতিবাদের উল্লেখ করিয়া দ্বিতীয় আর একটি প্রবন্ধ লিখিতে হয়। বলা বাহুল্য যে, এ ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব নহে; সুতরাং সংক্ষেপে তাঁহার মন্তব্যের দুই একটি কথার উত্তর প্রদান করিতেছি।

"চণ্ডীদাস" সম্বন্ধে বক্তব্য যে, যদিও অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মুখে মুকুন্দ যে পদ গান করিয়াছিলেন, তাহার "রোজনাম্‌চা" কেহ রাখে নাই এবং কবিরাজ গোস্বামী তাহার একশত বৎসর পরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে ঠিক সেই গানই উদ্ধৃত করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে, তথাপি ইহার উত্তরে এই কথা বলিতে পারা যায় যে, যে মুকুন্দ এই গান গাহিয়াছিলেন, তিনি পুরীধামে বহুবার উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ গায়ক শ্রীপাদ স্বরূপের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা আশ্চর্য্য নহে যে, মুকুন্দের মুখে শুনিয়া শ্রীপাদ তাহা নিজ অন্তরঙ্গ ভক্ত দাস গোস্বামীর নিকট উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রণয়নকালে দাস গোস্বামী ঐ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজকে উপদেশ দিয়াছিলেন। সুতরাং বিষয়টি যে, 'রোজনামচা'র ব্যঙ্গোক্তিতে উড়াইয়া দিবার নহে, ইহা বলা বোধ হয় আবশ্যক।

"শ্রীগৌরাঙ্গপ্রবর্ত্তিত পবিত্র প্রেমধর্ম্ম প্রচারের পর জনসাধারণের আগ্রহাতিশয্যে কীর্ত্তনীয়াগণ বাধ্য হইয়া চণ্ডীদাসের নামে কতকগুলি জাল পদ প্রচলন করিয়াছিলেন।"—ইহার মত হাস্যোদ্দীপক যুক্তি আর নাই।

"নয়নানন্দ", "জগদানন্দ","গোকুলানন্দ", এই যে তিনজন পদাবলী-রচয়িতার উল্লেখ করিয়াছি, ইঁহারা পূর্ব্বোল্লিখিত প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা না হইলেও নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ নহেন, ইঁহারা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তাহার "প্রমাণ" আছে। ইঁহাদের বিষয় বহুপূর্ব্বে আমরা বীরভূম হইতে প্রকাশিত "বীরভূমি" নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইঁহাদের নিবাস বীরভূম জেলার মঙ্গলডিহি গ্রামে, ইঁহাদের বংশধরগণ আজিও বর্ত্তমান আছেন এবং ইঁহাদের মধ্যে ঠাকুর নয়নানন্দের স্বহস্তলিখিত "শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব" নামক একখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে। 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' শীর্ষক দ্বিতীয় প্রবন্ধে আমরা ইঁহাদের পরিচয় ও পদাবলী প্রকাশ করিব।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

প্রজানিয়মনে ও সুপ্রজাবর্দ্ধনে জ্যোতিষের প্রভাব*

যে প্রসঙ্গ আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতে যাইতেছি, সেটি যে একটি গুরুতর বিষয়, তাহা আপনারা ইহার নামকরণ হইতেই উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহার প্রথমাংশ লইয়া সর্ব্ববিধ সংবাদপত্রে—মায় দৈনিক পত্র হইতে মাসিক পত্র পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই আলোচনা হইয়াছে এবং আজও চলিতেছে। এমন কি, মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত এ বিষয়ে নীরব নহেন। আর পাশ্চাত্য দেশে এবং আমেরিকায় ইহার আলোচনা এমন হইতেছে যে, ঐ সকল দেশে স্থায়ী সভা হইয়াছে এবং বহু কৃতবিদ্য চিকিৎসক তাহাতে লিপ্ত আছেন। তাঁহারা এ বিষয়ের শৃঙ্খলাবদ্ধ আন্দোলন যাহাতে পৃথিবীব্যাপী হয়, তাহাতে উদ্যোক্তা হইয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগে ইউরোপ ও আমেরিকা কি স্বাধীনতায়, কি অর্থে, কি বীর্য্যে, কি বিদ্যায়, কি আত্মমর্য্যাদায়, ভারতবর্ষ হইতে শ্রেষ্ঠতা অর্জ্জন করিয়াছে বলিতে হইবে। সুতরাং ঐ সকল দেশে যদি কোন ধুয়া ওঠে, তাহার ঢেউ যে ইংরাজ-শাসিত ভারতভূমে লাগিবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। তাই আমাদের দেশে এ বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে। এ প্রবন্ধের অবতারণাও সেই কারণে।

এখন একটা বিষয় দেখিতে হইবে, নবসভ্যতাদীপ্ত ইউরোপ আমেরিকার ভাবধারা ও প্রাচীনতম ভারতের ভাবধারায় তফাৎ কি। প্রবন্ধের বিষয় উহারাই বা কি ভাবে ভাবিতেছে এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কি ভাবে ভাবিয়াছেন, ইহা একটু দেখা আবশ্যক। ইহা হইতেই নবীন ও প্রাচীনের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ যেমন প্রকাশ পাইবে, তেমনি ধৈর্য্য ও সংযমশক্তিও ধরা পড়িবে।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় বিবাহ যে একটা উচ্চ ধর্ম্মাঙ্গ, তাহা স্বীকৃত হয় নাই; পুত্রজন্মও যে একান্ত আবশ্যক এবং তাহা ধর্ম্মের বিশেষ অঙ্গ, তাহাও ঐ সভ্যতা স্বীকার করে না। ওখান হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য কামেন্দ্রিয়ের উপভোগ; এই জন্য সেখানে স্ত্রী সঙ্গিনী, মুগ্ধকারিণী, সৌন্দর্য্যময়ী, ভালবাসার পাত্রী, বিলাসের ভূমি, ভোগের সহায় এবং গৃহের অবলম্বন। আর সন্তান সন্ততির উৎপত্তি আকস্মিক ব্যাপার (Pure accident) এবং ভোগের নিদর্শন মাত্র। সন্তানাদির জন্মজন্য আগ্রহ নাই; তবে প্রাকৃতিক নিয়মে জন্মায়। শিশু জন্মগ্রহণ করিলে আপনা আপনি মায়ার বন্ধন পড়ে; সুতরাং কর্ত্তব্য দেখা দেয়। তদনুসারে তাহার লালন পালন। এইরূপই এখনকার সভ্য জগতের আদর্শ।

হিন্দুর সভ্যতা, ইহা হইতে একেবারে বিভিন্ন। সেখানে বিবাহ ধর্ম্ম; স্ত্রী ধর্ম্মসঙ্গিনী;

---

* ১৩৩৩।৫ই চৈত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবম বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

পুত্র পিণ্ডদাতা, বংশরক্ষাকর্ত্তা, পিতৃপুরুষের স্বর্গের খুঁটী। কন্যা, সৃষ্টিরক্ষার উপায় এবং তাহার পুত্র পিণ্ডদাতা। হিন্দুর দ্বিতীয়া স্ত্রী কামপত্নী; তাহাকে লইয়া ধর্ম্ম হয় না, সে কেবল বিলাসের জন্য। হিন্দুর সন্তান সন্ততি ধর্ম্মতঃ প্রয়োজন। সন্তান না হইলে তাহার নরক লাভ ঘটে, সন্তান হইলে নরক হইতে উদ্ধার হয়। শাস্ত্রের নির্দ্দেশ—হিন্দু জন্মমাত্র দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণে আবদ্ধ হয়। নিজের ক্রিয়াকর্ম্মে পূর্ব্বোক্ত দুইটী ঋণ হইতে মুক্ত হয় এবং সন্তান হইলেই তবে পিতৃঋণ হইতে মুক্তি। বিবাহ ব্যতীত বৈধ সন্তান জন্মে না, সন্তান না জন্মিলে পিতৃঋণ হইতে উদ্ধার হইবার উপায় নাই; সুতরাং হিন্দুর বিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্য এবং ইহা ধর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ। ইহাই হিন্দুর সভ্যতা ও আদর্শ। তবে কি হিন্দুর মধ্যে কামোপভোগ বলিয়া কিছু নাই, স্ত্রী কি উহার অঙ্গ নহে? পাশ্চাত্য সভ্যতায় স্ত্রীর যে মাপকাঠী ধরিয়াছে, উহা হিন্দুদের পরোক্ষ ভাব, কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাব ধর্ম্মাঙ্গ। হিন্দু যেখানে কেবল কামভোগের জন্য স্ত্রী গ্রহণ করে, সে স্ত্রীকে কামপত্নী বলে, ধর্ম্মকর্ম্মে সে বর্জ্জিতা, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হিন্দুধর্ম্মে স্ত্রীর সতীত্বই প্রধান লক্ষ্য, কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মে ইহা লক্ষ্যের বহির্ভূত। অন্ততঃ তাহারা সতীত্ব (chastity) যে ভাবে বুঝে, হিন্দু তাহা বুঝে না; সতীত্ব সম্বন্ধে হিন্দুর মাপ (standard) হইতে অপরের মাপ বেশ বিভিন্ন, অনেক নীচে। হিন্দুর ধারণা ও বিশ্বাস, স্ত্রীর সতীত্ব অক্ষুণ্ণ না থাকিলে সুপ্রজা অর্থাৎ সুসন্তান জন্মে না। আবার বৈধ সন্তান ব্যতীত সুপ্রজা হয় না। অন্য জাতির এ ধারণা আছে বলিয়া জানি না।

হিন্দুর মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল; তাহার এক কারণ, পুরুষের পুত্রোৎপাদিকা শক্তির যথেষ্ট ব্যবহার অর্থাৎ বহু সন্তান উৎপাদন। হিন্দুশাস্ত্রে বহু সন্তানের আবশ্যকতার বিষয় উল্লেখ আছে। পাছে পিণ্ড লোপ পায়, এই এক ভয় এক কারণ, আর এক কারণ যে, বহু সন্তান থাকিলে কেহ না কেহ গয়াদি তীর্থক্ষেত্রে পিতৃপুরুষের পিণ্ড দিতে সক্ষম হইবে। এ সবই ধর্ম্মঘটিত আবশ্যকতা।

অন্য জাতির মধ্যে যে বহু বিবাহ দেখা যায়, তাহা লোভ, মোহ, কাম ঘটিত। হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতির মধ্যে যে বিধবাবিবাহের বা পত্যন্তর গ্রহণের প্রথা প্রচলন, তাহারও কারণ হইতেছে—স্ত্রীলোকের যতটা সন্তান ধারণের ক্ষমতা আছে, তাহার সম্যক্ ব্যবহার করা। এমন কি, কোন জাতির ধারণা যে, স্ত্রীলোকের যতক্ষণ সন্তান ধারণ করিবার ক্ষমতা থাকে, ততক্ষণ তাহার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য; কেন না, কে বলিতে পারে, কোন্ গর্ভে কোন্ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবে? হিন্দুর মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রচলন নাই। তবে কখন কখন পুনর্ভূ বা পরপূর্ব্বা নামক বিধবাবিবাহ বা পত্যন্তর গ্রহণের কথা দেখা যায়, তাহা কামজ। আর সন্তান আবশ্যক হওয়ায় বিধবা বিবাহ হয় নাই, নিয়োগ হইয়াছে। হিন্দুর ধারণা, বিধবাবিবাহে সুপ্রজা উৎপন্ন হওয়া সুকঠিন। এই জন্য হিন্দুরা বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী নহে। মনু নিয়োগ সম্বন্ধেও তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তবে নিতান্ত আবশ্যক স্থলে নিয়োগের ব্যবস্থা দিয়াছেন। মোটের উপর হিন্দুর এ সমস্তই ধর্ম্মঘটিত।

হিন্দু ও হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতির পুত্রবিষয়ক ভাবধারা বুঝিবার জন্ত মোটামুটি দুই চারিটি কথা বলা হইল।

বর্ত্তমানে আমেরিকা ও পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রজা নিয়মন (birth control) করিবার ভীষণ চেষ্টা চলিতেছে, তাহার তিনটী প্রধান কারণ দেখা যাইতেছে। একটি হইতেছে অর্থ-সমস্যা। এক ব্যক্তির বহু সন্তানসন্ততি জন্মিলে সে তাহাদিগকে সম্যক্‌রূপে লালন পালন করিতে পারে না; ফলে দরিদ্রতা বৃদ্ধি পায়; তৎসঙ্গে কষ্ট দুঃখ চিন্তা দেখা দেয়; ইহাতে জাতি দরিদ্র হইয়া পড়ে এবং অকালমৃত্যু বাড়িয়া যায়। দ্বিতীয় কারণ হইতেছে যে, প্রসূতি বহু প্রসব করিলে অর্থাৎ এক নারী যদি ৪, ১০, ১২, ১৫, ২০টী সন্তানের জননী হয়, তাহা হইলে সেই দেহ সতেজ থাকে না, স্ত্রীসৌন্দর্য্যের হানি হয়, অকালবার্দ্ধক্য দেখা দেয়, অনেক স্থলে যক্ষ্মা প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি হয়, ফলে জীবনী শক্তি নষ্ট হয় এবং অনেক স্থলে এরূপ স্ত্রীলোক অকালে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া জীবন্মৃত অবস্থায় থাকে। তৃতীয় কারণ হইতেছে যে, স্ত্রীলোক বর্ষে বর্ষে প্রসব করিলে যে সন্তান সন্ততি জন্মায়, উহারা রুগ্ন হয়, দীর্ঘজীবী হয় না। এরূপ সন্তান কেবল পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি করিতেই জন্মায়, পৃথিবীর কোন কাজে আসে না।

এই সকল কারণেই বর্ত্তমান সভ্যতাবাদীরা গর্ভসংরোধের পক্ষপাতী। তাহাদের ধারণা, স্ত্রীপুরুষের উচ্ছৃঙ্খলতা রোধ করা সম্ভব নয়। অতএব এমন উপায় নির্দ্ধারণ করা দরকার, যাহাতে যৌন সম্বন্ধ ঘটিলেও গর্ভ নিবারিত থাকে। তাহার ফলে নানা ঔষধ ও নানা বাহ্য ব্যবহার্য্য যন্ত্রপাতির উদ্ভব হইয়াছে। আর এই সকল পুস্তক লিখিয়া ও লোক দ্বারা জন-সাধারণে প্রচার করা হইতেছে। উদ্দেশ্য, দরিদ্র লোকের সন্তানাদি-জনিত অর্থসমস্যার সমাধান, নারীর শরীর রক্ষা এবং শিশুমৃত্যু নিবারণ।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ঠিক এ জাতীয় চিন্তা বোধ হয় করেন নাই। আমাদের গ্রন্থাদি হইতে যাহা পাই, তাহাতে দেখিতে পাই, তাঁহারা দীর্ঘজীবী বলিষ্ঠ কর্ম্মঠ সন্তান সন্ততি কামনা করিতেন, নরনারীর স্বাস্থ্য রক্ষা ও দীর্ঘজীবন কিরূপে সম্ভব, তাহারও চিন্তা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা অর্থাভাবে সন্তান পালন হইবে না, এ চিন্তা করেন নাই। অর্থের অভাব ঘটিতে পারে, তাঁহারা কখন এ কথা ভাবিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য রক্ষাই এই সকল বিষয়ের সমাধানের পথ, ইহাই মহাত্মা গান্ধীর মত। আমাদের গ্রন্থাদি হইতে যাহা পাই, তাহাতে ব্রহ্মচর্য্যের কথা আছে; কিন্তু ইহাই একমাত্র পন্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় নাই। সংযমই ব্রহ্মচর্য্যের নামান্তর; কিছু সংযম যে আবশ্যক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা যাহা বলিয়াছে যে, নরনারীকে শুধু সংযমের পথে তাহার ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে রোধ করিলে চলিবে না, উহা বালির বাঁধের ন্যায় ভাঙ্গিয়া যাইবে। নরনারীর আকাঙ্ক্ষাকে ঐরূপে বাধা দিয়া রাখা যাইবে না। তাহার অবাধ গতি রাখিয়া ব্যবস্থা করিতে না পারিলে কিছুই হইবে না। এ মতবাদকে ফেলিয়া দেওয়া

চলিবে না। ইউরোপ আমেরিকা কোন উপায় না পাইয়া, নানাবিধ দ্রব্যাদির ও ঔষধের সাহায্য গ্রহণ করিতেছে।

আমরা আমাদের শাস্ত্রে ইহার সুন্দর সমাধান পাইতেছি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বর্ত্তমান ভাবের পথিক ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা যে ভাবেই ভাবুন না কেন, আমাদের জন্য এমন অক্ষয় ভাণ্ডার রাখিয়া গিয়াছেন যে, তাহার মধ্যে আমরা সকলের উপযোগী যাহা দরকার, তাহাও পাইতেছি।

হিন্দুরা সন্তানজন্ম ধর্ম্মাঙ্গ মনে করে। এই জন্য আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থে লেখা আছে—স্ত্রী পুষ্পবতী হইলে, ঐ কালমধ্যে গর্ভাধান না করিলে স্বামীর পাপ হয়। যথা পরাশর,—

ঋতুস্নাতাং তু যো ভার্য্যাং সন্নিধৌ নোপগচ্ছতি।
ঘোরায়াং ভ্রূণহত্যায়াং পততে নাত্র সংশয়ঃ॥

এই যাহাদের শাস্ত্রনির্দ্দেশ, তাহারা কখনও সন্তান সংরোধ চিন্তা (birth control) করিতে পারে না। তবে কামশাস্ত্রাদি গ্রন্থে গর্ভনিরোধের উপায়স্বরূপ ঔষধ ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। উহা হীনচরিত্র নরনারীর মধ্যে অথবা বেশ্যাদিগের মধ্যে কিছু প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিয়া থাকিবে। সভ্যসমাজে উহার বিশেষ আদর ছিল না। কেন না, ইহার বিস্তৃত আলোচনা ঐ সকল পুস্তকে নাই। আর বৈদ্যশাস্ত্রেও ইহার সাধারণ উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে গর্ভরোধের মাত্র দুইটী ঔষধের উল্লেখ আছে, তাহাও সেবন করিতে হয়। সুতরাং ইহা লইয়া বিশেষ গবেষণা দেখা যায় না। মোট কথা, আমাদের শাস্ত্র এই সকল কৃত্রিমতার প্রশ্রয়প্রদাতা নয়। ধর্ম্ম মানিয়া যাহা সম্ভব, তাহাই হিন্দুর ভাল লাগে, তাহাই করিতে চায়। আমাদের ধর্ম্মে এমন বিধি নিষেধ আছে, যাহা পালন করিলে লোক সংযমী হয়, কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে গর্ভরোধ করিবার আবশ্যক হয় না, নরনারীর দেহ সুস্থ, সবল, কর্ম্মঠ থাকে, দীর্ঘ জীবন লাভ হয়, ইচ্ছামত সন্তান সন্ততি লাভ করা যায়। এ বিষয়ে হিন্দুরা জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর অনেকটা নির্ভর করিয়াছেন। জ্যোতিষে কি করিয়া ইহা সম্ভব, তাহাই এখন বলিব।

এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক। হিন্দু ধর্ম্ম এমনভাবে গঠিত যে, তাহার এক শাস্ত্র লইয়া এক কার্য্যের মীমাংসা হওয়া অনেক সময় সুকঠিন। ইহার শাস্ত্ররাজি এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, একটি ধরিয়া টান দিলে অন্যটি আপনি আসিয়া পড়ে। এইজন্য এক জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হইলে ইহার সহিত স্মৃতি, তন্ত্র, যোগশাস্ত্র, মন্ত্রশাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ কিছু জানা আবশ্যক। এইরূপ সর্ব্বত্র। ইহার কারণ এই যে, এই শাস্ত্রগুলি এক বৃক্ষের বিভিন্ন শাখা, তাই এক ডাল ধরিয়া টান দিলে অন্য ডালগুলিও নড়িয়া উঠে।

হিন্দুর প্রধান লক্ষ্য সন্তান। সেই সন্তান যাহাতে সুসন্তান হয়, তাহাই তাহার প্রধানতম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে হিন্দুশাস্ত্রকারগণ জ্যোতিষাদি শাস্ত্রে যে বিধি বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যেই পরোক্ষভাবে বর্ত্তমান ভাবধারা পড়িয়া গিয়াছে। হিন্দুরা

সন্তান-রোধের কথা ভাবেন নাই সত্য ; কিন্তু সুসন্তান লাভের যে প্রণালী স্থির করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে উচ্ছৃঙ্খলতার সহিত সন্তান সম্ভাবনা নিরোধ হইয়া গিয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছে যে, রজঃ ও বীর্য্য সন্তান সন্ততির কারণ। ইহাদের মিশ্রণেই ভ্রূণের জন্ম হয়। যথা,—"সৌম্যং শুক্রং আর্ত্তবং আগ্নেয়ম্ ॥ তত্র স্ত্রীপুংসয়োঃ সংযোগে তেজঃ শরীরাদ্বায়ুরুদীরয়তি। ততস্তেজঃ অনিলসন্নিপাতাৎ শুক্রচ্যুতং যোনিমভি প্রতিপদ্যতে, সংসৃজ্যতে চার্ত্তবেন। ততোঽগ্নিসোমসংযোগাৎ সংসৃজ্যমানো গর্ভো গর্ভাশয়মনুপ্রতিপদ্যতে।" (সুশ্রুতসংহিতায় শারীরস্থান, ৩য় অধ্যায়)।

"অতুল্যগোত্রস্য রজঃ ক্ষয়ান্তে
রহো বিসৃষ্টং মিথুনীকৃতস্য।
কিং স্যাচ্চতুষ্পাৎ প্রভবঞ্চ ষড়্ভ্যো
যৎ স্ত্রীষু গর্ভত্বমুপৈতি পুংসঃ ॥ ২ ॥
শুক্রং তদস্য প্রবদন্তি ধীরা
যদ্ধীয়তে গর্ভসমুদ্ভবায় ॥ ৩ ॥" (চরকসংহিতায় শারীরস্থান, ২য় অধ্যায়)।

তথা ভাবপ্রকাশে পূর্ব্বখণ্ডে প্রথম ভাগে গর্ভপ্রকরণে,—

"কামান্মিথুনসংযোগে শুদ্ধশোণিতশুক্রজঃ।
গর্ভঃ সংজায়তে নার্য্যাঃ স জাতো বাল উচ্যতে ॥
ঋতৌ স্ত্রীপুংসয়োর্যোগে মকরধ্বজবেগতঃ।
মেঢ্রযোন্যভিসংঘর্ষাৎ শরীরোষ্মানিলাহতঃ ॥
পুংসঃ সর্ব্বশরীরস্থং রেতো দ্রাবয়তেঽথ তৎ।
বায়ুর্মেহনমার্গেণ পাতয়ত্যঙ্গনাভগে ॥
তৎ সংশ্রুত্য ব্যাত্তমুখং যাতি গর্ভাশয়ং প্রতি।
তত্র শুক্রবদায়াতেনার্ত্তবেন যুতং ভবেৎ ॥"

জ্যোতিষ শাস্ত্রেরও ইহাই মত। যথা,—"গর্ভাবাসে নিপততি সংযোগঃ শুক্রশোণিতয়োঃ।" (সারাবলী)। অতএব পুরুষের শুক্র ধাতু ও স্ত্রীর আর্ত্তবই গর্ভের কারণ। ইহাই সর্ব্ববাদি-সম্মত।

জ্যোতিষের মতে, শুক্র গ্রহই শুক্রধাতুর কারক। চন্দ্রগ্রহ শোণিতের কারক। এবং মঙ্গলগ্রহ মজ্জা ও রক্তবাহিকা নাড়ীর কারক। শুক্রে জলতত্ত্ব, চন্দ্রেও জলতত্ত্ব এবং মঙ্গলে অগ্নিতত্ত্ব চিন্তনীয়। আর শুক্র ও চন্দ্র উভয়েই জলগ্রহ এবং মঙ্গল শুষ্কগ্রহ ও শুষ্কতা উৎপাদক। সুশ্রুত বলিয়াছেন,—"আর্ত্তবং আগ্নেয়ং"। জ্যোতিষেও চন্দ্রকে আর্ত্তব ও মঙ্গলকে আর্ত্তববাহিনী নাড়ী বলিতেছে। এই জন্যই জ্যোতিষমতে স্ত্রীরজের কারক চন্দ্র ও মঙ্গল ; যথা বৃহজ্জাতকে,— "কুজেন্দুহেতুঃ প্রতিমাসমার্ত্তবং"। তথা ভট্টোৎপলধৃত সারাবলী—"ইন্দুর্জলং কুজোঽগ্নিঃ জল-মিশ্রমগ্নিরেব পিত্তং স্যাৎ এবং রক্তে ক্ষুভিতে পিত্তেন রজঃ প্রবর্ত্ততে স্ত্রীষু" অর্থাৎ চন্দ্র জল, মঙ্গল

অগ্নি ; এই জল ও অগ্নি মিশ্রিত হইলে পিত্তের উৎপত্তি হয় এবং ঐ পিত্ত রক্তকে সঞ্চালিত করিয়া নিঃসারিত করে, তাহাই ঋতু নামে কথিত।

নারীর মাসিক ঋতুই তাহার গর্ভধারণক্ষম-কাল নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। এই ঋতুর কাল সাধারণতঃ মোটামুটি স্থির থাকে। চন্দ্রের প্রতি মঙ্গলের দৃষ্টিই আর্ত্তব নিঃসরণের কারণ ধরা যায়। মাসিক আর্ত্তবই গর্ভের কারণ পাওয়া যাইতেছে। এখন জ্যোতিষ সাহায্যে গর্ভধারণ-ক্ষম আর্ত্তব কোন্‌টি এবং কোন্ আর্ত্তব গর্ভধারণক্ষম নহে, তাহা স্থির করিতে পারিলেই জ্যোতিষ দ্বারা কিরূপে প্রজানিয়মন (birth control) সম্ভব, তাহা জানা যাইবে। আমরা পাইতেছি,—"তৎ উপচয়সংস্থে বিফলং প্রতিমাসং দর্শনং তস্যাঃ"—(ভট্টোৎপল) এবং "স্যাৎ অন্যথা নিষ্ফলম্"—(জাতকপারিজাতে ৩য় অধ্যায়ে ১৬ শোক)—উপচয়গত অর্থাৎ স্ত্রীকোষ্ঠীতে জন্মলগ্ন হইতে ৩য়, ষষ্ঠ, ১০ম, ১১শ গত চন্দ্রে মঙ্গলেব পূর্ণ দৃষ্টিতে যে মাসিক আর্ত্তব দেখা যায়, ঐ আর্ত্তব নিষ্ফল অর্থাৎ উহা গর্ভধারণক্ষম নহে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, জ্যোতিষ জাতচক্রে গ্রহাদি সংস্থান দ্বারা এবং গোচরগত গ্রহাদির অবস্থান হইতে নির্দ্দেশ করিতে পারে, কোন্ আর্ত্তব বিফল হইবে আর কোন্ আর্ত্তব সফল হইবে, অর্থাৎ কোন্ আর্ত্তব গর্ভধারণক্ষম, তাহা জানিবার উপায় আছে। এক্ষণে উহা আরও স্পষ্ট করা হইতেছে, যথা—

"গতে তু পীড়র্ক্ষমনুষ্ণদীধিতৌ।"—(বৃহজ্জাতক) "অনুষ্ণদীধিতৌ শীতময়ূখে চন্দ্রে পীড়র্ক্ষং গতে প্রকৃতত্বাৎ। স্ত্রীণামনুপচয়গৃহাশ্রিতে আর্ত্তবকারণং ভবতি। অর্থাদেব যদি চন্দ্রঃ কুজসন্দৃষ্টো ভবতি। এতদুক্তং ভবতি। স্ত্রিয়ো জন্মর্ক্ষাদনুপচয়সংস্থশ্চন্দ্রমাঃ তত্র যত্তঙ্গারকেণ দৃশ্যতে তদা গর্ভগ্রহণক্ষমমার্ত্তবমতীব হেতুর্ভবতি।"—(ভট্টোৎপল)।

তথা চ সারাবল্যাং,—"অনুপচয়রাশিসংস্থে কুমুদাকরবান্ধবে।
রুধিরদৃষ্টে প্রতিমাসং যুবতীনাং ভবতীহ রজো স্রবন্তোকে॥"

তথা চ ১৬ শ্লোকে, তৃতীয়াধ্যায়ে, জাতকপারিজাতে,—

"শীতজ্যোতিষি যোষিতোঽনুপচয়স্থানে কুজেনেক্ষিতে জাতং গর্ভফলপ্রদং খলু রজঃ"

অর্থাৎ নারীর জন্মলগ্ন হইতে কোন অনুপচয়রাশিতে (অর্থাৎ লগ্ন, দ্বিতীয়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১২শ রাশিতে) চন্দ্র থাকিলে এবং ঐ চন্দ্রের উপর মঙ্গলের পূর্ণদৃষ্টি পড়িলে যে আর্ত্তব দেখা যায়, ঐ আর্ত্তবই গর্ভধারণক্ষম হইয়া থাকে।

আবার বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

স্ত্রীণাং গতোঽনুপচয়র্ক্ষমনুষ্ণরশ্মিঃ
সংদৃশ্যতে যদি ধরাতনয়েন তাসাম্।
গর্ভগ্রহার্ত্তবমুশন্তি তদা ন বন্ধ্যা-
বৃদ্ধাতুরাল্পবয়সামপি চৈতদিষ্টম্॥

এই শ্লোকে বন্ধ্যা স্ত্রী, বৃদ্ধা, আতুর ও বালিকা বর্জ্জিত হইল অর্থাৎ ইহারা গর্ভগ্রহণক্ষম নহে জানিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে গর্ভপ্রকরণমধ্যে ভাবপ্রকাশধৃত "তন্ত্রান্তরে" বলিয়া উল্লিখিত অংশমধ্যে পাইতেছি,—

মনোভবাগারমুখেঽবলানাং তিস্রো ভবন্তি প্রমদাঙ্গনানাম্।
সমীরণা চান্দ্রমসী চ গৌরী বিশেষমাসামুপবর্ণয়ামি॥
প্রধানভূতা মদনাতপত্রে সমীরণা নাম বিশেষনাড়ী।
তস্যা মুখে যৎ পতিতং তু বীর্য্যং তন্নিষ্ফলং স্যাদিতি চন্দ্রমৌলিঃ॥
যা চাপরা চান্দ্রমসী চ নাড়ী কন্দর্পগেহে ভবতি প্রধানা।
সা সুন্দরী যোষিতমেব সূতে সাধ্যা ভবেদল্পরতোৎসবেষু॥
গৌরীতি নাড়ী যদুপস্থগর্ভে প্রধানভূতা ভবতি স্বভাবাৎ।
পুত্রং প্রসূতে বহুধাঙ্গনা সা কষ্টোপভোগ্যাসুরতোপবিষ্টা॥

ইহা হইতে পাওয়া গেল যে, গর্ভধারণ বিষয়ে সমীরণা, চান্দ্রমসী ও গৌরী, এই তিনটি নাড়ীই প্রধান। নাড়ী অর্থে বায়ু। এই বায়ু শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যতীত কিছুই নহে। যখন স্ত্রীদেহে সমীরণা নাড়ী বহিতে থাকে, তখন নিষেকে গর্ভ সঞ্চার হয় না। চান্দ্রমসী নাড়ীর প্রবাহকালে নিষেক হইলে গর্ভ সঞ্চার হয়, তাহাতে কন্যার উৎপত্তি হয়। এবং যখন গৌরী নাড়ী প্রবাহিত থাকে, তখন আধান হইলে গর্ভসঞ্চার হয়, তাহাতে পুত্র উৎপন্ন হয়।

স্ত্রীদেহে এই নাড়ীর যেরূপ প্রভাব আছে, পুরুষের দেহেও নাড়ীর এইরূপই প্রভাব জানিতে হইবে। এ সম্বন্ধে প্রাণতোষিণী।—

"যা বামমুষ্কসম্বন্ধা সংশ্লিষ্যান্তী সুষুম্নয়া।
দক্ষিণাঙ্ক ক্রমাশ্রিত্য ধনুর্ব্বক্রা হৃদি স্থিতা॥
বামাংশযন্ত্রান্তরগা দক্ষিণাং নাসিকামিয়াৎ।
তথা দক্ষিণমুষ্কস্থা নাসায়া বামরন্ধ্রগা॥

তন্ত্রান্তরে,—সুষুম্নাকলিতা যাতা মুষ্কং দক্ষিণমাশ্রিতা।
সঙ্গতা বামভাগস্থ যন্ত্রমধ্যং সমাশ্রিতা॥
দক্ষিণং নাসিকাদ্বারং প্রাপ্নোতি গিরিজাত্মজে।
বামমণ্ডমনুস্যূতা মনস্যাসব্যনাসিকাম্॥

অত্রেড়া বামমুষ্কাধঃস্থা ধনুর্ব্বক্রা বামনাসাপর্য্যন্তং গতা। এবং পিঙ্গলা দক্ষিণাণ্ডাধঃস্থা ধনুর্ব্বক্রা দক্ষিণনাসান্তং গতা। পৃষ্ঠবংশান্তর্গতা সুষুম্না ইতি" (প্রাণতোষিণী, পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫)। ইড়ানাড়ী, পিঙ্গলানাড়ী ও সুষুম্নানাড়ী, এই তিন নাড়ীর মধ্যে সাধারণতঃ ইড়াকে চন্দ্র ও পিঙ্গলাকে সূর্য্যনাড়ী কহে। বামনাসাতে যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহার নাম ইড়া বা চান্দ্রমসী। দক্ষিণনাসাস্থ বায়ুকে পিঙ্গলা বা গৌরী কহে। এবং উভয় নাসাপুটস্থিত বায়ুকে সুষুম্না বা সমীরণা বলে। এই নাড়ী বিচার করিয়া চলিতে পারিলে কিংবা কোষ্ঠীনির্দ্দিষ্ট আর্ত্তব বিচার করিয়া স্থির করিয়া লইতে পারিলে গর্ভনিয়মন নিজের হাতে আসিয়া পড়ে।

গর্ভ নিরোধের কথা বলা হইল। এক্ষণে সুসন্তান কিরূপে স্বেচ্ছাধীন সম্ভব, তাহাই বলিব। ইতিপূর্ব্বে গর্ভসংবোধ বলিতে যাইয়া দেখাইয়াছি যে, চান্দ্রমসী নাড়ীতে গর্ভাধান হইলে কন্যার জন্ম হয় এবং গৌরী নাড়ীতে গর্ভাধান হইলে পুত্র জন্মায়। আর কোন্ আর্ত্তবে গর্ভধারণ হয়, তাহাও,—

শীতজ্যোতিষি যোষিতোঽনুপচয়স্থানে কুজেনেক্ষিতে
জাতং গর্ভফলপ্রদং খলু রজঃ স্যাদন্যথা নিষ্ফলম্॥—(জাতকপারিজাত, ৩।১৬)।

এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বে বলিয়াছি। অর্থাৎ অনুপচয়রাশিগত চন্দ্রে মঙ্গলের দৃষ্টি পড়িলে যে ঋতু হয়, তাহা গর্ভ গ্রহণের উপযোগী হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত হইলে হয় না। সুপুত্র লাভ করিতে হইলে আরও একটু বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। শাস্ত্র বলিতেছে,—

বিভাবরী-ষোড়শ ভামিনীনাং ঋতুদ্‌গমাদ্যা ঋতুকালমাহুঃ।
নাদ্যাশ্চতস্রোঽত্র নিষেকযোগ্যাঃ পরাশ্চ যুগ্মাঃ সুতদাঃ প্রশস্তাঃ॥
—(জাঃ পাঃ ৩।১৭)।

ষোড়শ দিন নারীদিগের আর্ত্তব কাল। তাহার প্রথম চারি দিন নিষেকের অযোগ্য দিন এবং অবশিষ্ট দিনগুলির মধ্যে যুগ্ম দিন পুত্রপ্রদ বলিয়া নিষেকে প্রশস্ত।

"ভাবপ্রকাশ" এ সম্বন্ধে বলিতেছেন,—"যুগ্মাসু পুত্রা জায়ন্তে স্ত্রিয়োঽযুগ্মাসু রাত্রিষু" অর্থাৎ ঋতুর যুগ্ম দিনে গর্ভাধানে পুত্র এবং অযুগ্ম দিনে (অর্থাৎ ৫, ৭, ৯, ১১, ১৩, ১৫) গর্ভাধানে কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

শাস্ত্রে কতকগুলি দিনে আধান করিতে নিষেধ করিয়াছে, যথা—

তাসামাদ্যাশ্চতস্রস্তু নিন্দিতৈকাদশী চ যা।
ত্রয়োদশী চ শেষাস্তু প্রশস্তা দশ রাত্রয়ঃ॥—মনু, ৩।৪৭।
পর্ব্ববর্জ্জং ব্রজেচ্চৈনাং॥—মনু, ৩।৪৫।

প্রথম চারিটী দিন, একাদশ দিন ও ত্রয়োদশ দিন, এই ছয় দিন নিন্দিত এবং অবশিষ্ট দশ দিন প্রশস্ত। এই দশ দিনের মধ্যে পর্ব্বদিন বর্জ্জন করিতে হইবে। পর্ব্বদিন বলিতে—

চতুর্দ্দশ্যষ্টমী চৈব অমাবস্যা চ পূর্ণিমা।
পর্ব্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র রবিসংক্রান্তিরেব চ॥—(বিষ্ণুপুরাণ)।

চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা তিথিগুলি এবং সংক্রান্তি, এগুলি বর্জ্জন করিতে হইবে। তদ্ব্যতীত শ্রাদ্ধদিন, গ্রহণদিন, দিব্য-আন্তরীক্ষ-ভৌম্য উৎপাতদিন, দিবাভাগ, ব্যতীপাতযোগ, বৈধৃতিযোগ, সন্ধ্যাকাল, পরিঘযোগের পূর্ব্বার্দ্ধকাল, নিধনতারা, জন্মনক্ষত্র, জন্মলগ্নের বা জন্ম-রাশির অষ্টম লগ্ন, জন্মলগ্নে বা জন্মনক্ষত্রে পাপগ্রহযুক্ত কাল, জ্যেষ্ঠা, মূলা, মঘা, অশ্লেষা, রেবতী, কৃত্তিকা, অশ্বিনী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রগুলি বর্জ্জন করিবার বিধি জ্যোতিষে ও স্মৃতিশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্জিকায় গর্ভাধানের দিন ও কাল নির্দ্দেশ

থাকে। ঐ দিনে, ঐ সময়ে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের শুক্লপক্ষে চন্দ্রশুদ্ধি ও কৃষ্ণপক্ষে তারাশুদ্ধি দেখিয়া গর্ভাধান করিলে যে পুত্র বা কন্যা জন্মিবে, সেই অপত্য যে উৎকৃষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এগুলি যাহা বলা হইল, তাহা কেবল উৎকৃষ্ট সন্তানের জন্য। সাধারণ সন্তানের জন্য এত বিধিনিষেধ মানিবার আবশ্যক নাই। কেবল নাড়ী বুঝিয়া বা গর্ভধারণক্ষম আর্ত্তব বুঝিয়া চলিলেই যথেষ্ট।

কিরূপ অবস্থায় স্ত্রী পুরুষে সংযোগ হয়, তৎসম্বন্ধে মণিথ বলিতেছেন,—

ঋতুবিরামে স্নাতায়াং যদ্যাপচয়স্থঃ শশী ভবতি।
বলিনা গুরুণা দৃষ্টো ভর্ত্রা সহ সঙ্গমশ্চ তদা॥

অর্থাৎ আর্ত্তবের নিবৃত্তি হইলে পর যখন স্ত্রীকোষ্ঠীতে গোচরে চন্দ্র উপচয়গৃহগত হইবে, তাহাতে বলবান্ বৃহস্পতির দৃষ্টি পড়িলে স্ত্রী পুরুষের মিলন হয়। "সারাবলী"র মতে,—

উপচয়ভবনে শশভৃদ্দৃষ্টো গুরুণা সুহৃদ্ভিরথবাসৌ।
পুংসা করোতি যোগং বিশেষতঃ শুক্রসংদৃষ্টঃ॥

অর্থাৎ উপচয়গৃহগত চন্দ্রকে বৃহস্পতি বা বন্ধুগ্রহ দেখিলে পুরুষের সহিত যুবতী সংযুক্ত হয়, যদি শুক্রকর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সংযুক্ত হইবে। কিন্তু "বাদরায়ণ" বলিতেছেন,—

পুরুষোপচয়গৃহস্থো গুরুণা যদি দৃশ্যতে হিমময়ূখঃ।
স্ত্রীপুরুষসম্প্রয়োগং তদা বদেৎ অন্যথা নৈবমিতি॥

অর্থাৎ পুরুষের কোষ্ঠীতে গুরুদৃষ্ট চন্দ্র উপচয়গৃহে থাকিলে স্ত্রী পুরুষের মিলন হয়।

কোন্ সময় গর্ভধারণ হইবে, তৎসম্বন্ধে বর্ণিত হইতেছে,—

পীড়ারাশৌ ভৌমদৃষ্টে শশাঙ্কে মাসং মাসং যোষিতামার্ত্তবং যৎ।
ত্র্যংশে শান্তং যচ্চ রক্তং জবাভং তদ্গর্ভার্থং বেদনাগন্ধহীনম্॥—শুদ্ধিদীপিকা।

অর্থাৎ স্ত্রীকোষ্ঠীতে গোচরে অনুপচয়রাশিতে চন্দ্র উপস্থিত হইলে, ঐ চন্দ্রে মঙ্গল অবলোকন করিলে প্রতিমাসে স্ত্রীগণের রজঃ উৎপন্ন হয়। যে আর্ত্তব তিন দিনেই প্রশমিত হইয়া যায়, যাহার বর্ণ জবাপুষ্পের সদৃশ হয় এবং যাহাতে বেদনা বা গন্ধ থাকে না, সেই ঋতু গর্ভগ্রহণক্ষম বুঝিতে হইবে।

গর্ভগ্রহণক্ষম ঋতু পরিজ্ঞাত হইয়া কোন্ সময় আধান করিলে গর্ভসম্ভব হইবে, তাহার নির্দ্দেশ জ্যোতিষশাস্ত্র এইরূপ করিয়াছেন,—

রবীন্দুশুক্রাবনিজৈঃ স্বভাগগৈঃ
গুরৌ ত্রিকোণোদয়সংস্থিতেঽপি বা।
ভবত্যপত্যং হি বিবীজিনামিমে
করা হিমাংশোর্বিদৃশামিবাফলা॥—বৃঃ জাঃ, ৪।১

অর্থাৎ [ক] নিষেককালে রবি, চন্দ্র, শুক্র ও মঙ্গল, ইহারা যে কোনও রাশিগত হইয়া

স্বীয় স্বীয় নবাংশে থাকিলে গর্ভ হইবে। এখানে টীকাকার ভট্টোৎপল বলিতেছেন,—(১) যদি ঐ সকল গ্রহ স্বীয় স্বীয় নবাংশে না থাকে, তাহা হইলে পুরুষের কোষ্ঠীতে উহাদের মধ্যে দুইটী গ্রহ উপচয়গৃহগত হইয়া স্বীয় স্বীয় নবাংশে থাকিলে গর্ভ সম্ভব। (২) কিংবা স্ত্রীকোষ্ঠীতে চন্দ্র ও মঙ্গল উপচয়গৃহগত হইয়া স্বীয় স্বীয় নবাংশে থাকিলেও গর্ভ হইবে। এই প্রসঙ্গে "স্বল্পজাতকে"র বচন তুলিয়া বলিতেছেন,—(৩) রবি ও শুক্র উভয়েই বলবান্ হইয়া স্বীয় স্বীয় নবাংশে থাকিয়া পুরুষের কোষ্ঠীতে উপচয়গৃহে থাকিলে গর্ভ হইবে। (৪) অথবা চন্দ্র ও মঙ্গল উভয়েই বলবান্ হইয়া স্বীয় স্বীয় নবাংশে থাকিয়া স্ত্রীকোষ্ঠীর উপচয়রাশিতে থাকিবে, তাহা হইলে গর্ভ হইবে। [খ] নিষেককালে বৃহস্পতি যদি লগ্নে বা নবমে বা পঞ্চমে থাকে, তাহা হইলে গর্ভ হইবে। কিন্তু উক্ত যোগ বীর্য্যহীনের পক্ষে নিষ্ফল, যেরূপ অন্ধের চক্ষে চন্দ্রের কিরণ।

কিরূপ অবস্থায় গর্ভ সম্ভব হয়, তাহা বলা হইল। এখন কোন্ গর্ভে পুত্র হইবে বা কোন্ গর্ভে কন্যা হইবে, তাহা নির্ণয় করিবার বিধি কথিত হইতেছে। "চরকসংহিতা"য় লিখিত আছে, "রক্তেন কন্যামধিকেন পুত্রং শুক্রেণেত্যাদি"। স্ত্রীর রক্তের আতিশয্য হইলে কন্যা জন্মে এবং পুরুষের বীর্য্যের আধিক্য ঘটিলে পুত্র জন্মে। ইহা হইতে বিশেষ কিছু নির্ণয় করা যায় না। কোথায় রক্তাধিক্য হইল, কোথায় বীর্য্যাধিক্য হইল, ইহা কিরূপে অনুভব করা যাইবে? যুগ্ম দিন ও অযুগ্ম দিন বলিয়া যে নির্দ্দেশ আছে, তাহাও প্রত্যক্ষ প্রমাণে অসিদ্ধ বলিলে বিশেষ দোষের নাও হইতে পারে। ইহার হিসাবে শতকরা ৫টি মিলিলেও মিলিতে পারে। তবে স্বরোদয় শাস্ত্রে যে ইড়া পিঙ্গলা নাড়ীর কথা আছে, তাহার সহিত ইহার যোগ করিলে ইহার অর্থনির্ণয় সম্ভব। পিঙ্গলা বহমান কালে রেতাধিক্য থাকে এবং ইড়া প্রবাহকালে রেতাল্পতা পরিদৃষ্ট হয়। এইজন্য বলা হইয়াছে এবং প্রত্যক্ষও করা গিয়াছে যে, পিঙ্গলা বাহিনী থাকা কালে নিষেকে পুত্রই জন্মায়। এবং ইড়ায় নিষেক হইলে কন্যাই জন্ম গ্রহণ করে। এই নাড়ী লইয়া আরও অনেক সূক্ষ্ম বিচার আছে, তাহা এ প্রবন্ধে অবতারণার আবশ্যক নাই।

জ্যোতিষে দেখিতে পাই যে,—

জীবাষ্টবর্গাধিকবিন্দুরাশৌ লগ্নে নিষেকঃ কুরুতে সুতার্থম্॥—জাঃ পাঃ, ১০।২৩।

বৃহস্পতির অষ্টবর্গে যে রাশিতে রেখাধিক্য থাকে, সেই লগ্নে নিষেক করিলে পুত্র জন্মে।

অষ্টমাষ্টমগে সূর্য্যে নিষেকর্ক্ষাৎ সুতোদ্ভবঃ।

অথবাহধানলগ্নাত্তু ত্রিকোণস্থে দিনেশ্বরে॥—জাঃ পাঃ, ৩।১৯।

নিষেকলগ্নের তৃতীয়ে, নবমে বা পঞ্চমে রবি থাকিলে পুত্র জন্মে।

অস্মিন্নাধানলগ্নে তু শুভদৃষ্টে যুতেহথবা।

দীর্ঘায়ুর্ভাগ্যবান্ জাতঃ সর্ব্ববিদ্যাস্বমেষ্যতি॥—জাঃ পাঃ ৩।২০।

ঐ নিষেকলগ্নে যদি শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে বা শুভগ্রহযুক্ত হয়, তাহা হইলে জাতক দীর্ঘায়ু, ভাগ্যবান্, সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হয়।

ওজর্ক্ষে পুরুষাংশকেষু বলিভির্লগ্নার্কগুর্বিন্দুভিঃ
পুংজন্ম প্রবদেৎ সমাংশকগতৈর্যুগ্মেষু তৈর্যোষিতঃ ৷
গুর্বর্কৌ বিষমে নরং শশিসিতৌ বক্রশ্চ যুগ্মে স্ত্রিয়ম্ ॥—বৃঃ জাঃ ৪।১১।

(১) নিষেককালে লগ্ন, রবি, বৃহস্পতি ও চন্দ্র, ইহারা বলবান্ হইয়া পুরুষরাশিতে ও পুরুষ-নবাংশে থাকিলে পুত্র জন্মিবে। (২) আর ঐ লগ্ন ও ঐ গ্রহগণ বলবান্ হইয়া স্ত্রীরাশি ও স্ত্রীনবাংশগত হইলে কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে। (৩) বৃহস্পতি ও রবি পুরুষরাশিতে থাকিলে পুত্র এবং (৪) চন্দ্র, শুক্র ও মঙ্গল স্ত্রীরাশিতে থাকিলে কন্যা জন্মিবে।

বিহায় লগ্নং বিষমর্ক্ষসংস্থঃ সৌরোঽপি পুংজন্মকরো বিলগ্নাৎ।—বৃঃ জাঃ, ৪।১২।

নিষেককালে লগ্ন ব্যতীত অন্য বিষম রাশিতে শনি থাকিলে পুত্র জন্মায়।

[টীকাকার ভট্টোৎপল বলেন যে, এই যোগ উপরিউক্ত যোগের অভাবে গ্রহণ করিতে হইবে]

এখন নিষেকলগ্ন বলা হইতেছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, পঞ্জিকাতে গর্ভাধানের সময় লিখিত থাকে। ঐ সময়মধ্যে নিষেক করিলে সাধারণতঃ আয়ুষ্মান্ সুসন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা। আর যদি ঐ সঙ্গে স্ত্রী ও পুরুষের চন্দ্রতারা শুদ্ধ দেখিয়া আধান হয়, তাহা হইলে সে সন্তান যে দীর্ঘজীবী ও সৎসন্তান হইবে, এইরূপ আশা করা অন্যায় নহে। আধানলগ্ন নির্ণয় করিবার নিয়ম হইতেছে,—

কেন্দ্রত্রিকোণেষু শুভৈশ্চ পাপৈস্ত্র্যায়ারিগৈঃ পুংগ্রহদৃষ্টলগ্নে।
ওজাংশগেঽব্জেঽপি চ যুগ্মরাত্রৌ চিত্রাদিতীজ্যাশ্বিষু মধ্যমং স্যাৎ॥

—(মুহূর্ত্তচিন্তামণি)।

অর্থাৎ আধানলগ্নের কেন্দ্র ও ত্রিকোণে শুভগ্রহ থাকিবে, তৃতীয়, ষষ্ঠ, একাদশে পাপ থাকিবে, লগ্নে পুংগ্রহের (রবি, মঙ্গল বা বৃহস্পতির) দৃষ্টি থাকিবে, বিষম রাশির নবাংশে চন্দ্র থাকিবে। গর্ভাধানের প্রশস্ত নক্ষত্র না পাইলে, চিত্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা ও অশ্বিনী নক্ষত্রেও গর্ভাধান চলিতে পারে, ইহা মধ্যম পর্য্যায়। যুগ্ম দিনই আধানে প্রশস্ত। "শুদ্ধিদীপিকা"-মতে,—

পাপাসংযুতমধ্যগেষু দিনকৃল্লগ্নক্ষপান্থামিষু
তদ্দ্যূনেষ্বশুভোজ্ঝিতেষু বিকুজে ছিদ্রে বিপাপে সুখে।
সদ্‌যুক্তেষু ত্রিকোণকণ্টকবিধুষায়ত্রিষষ্ঠাশ্বিতে
পাপে যুগ্মনিশাস্বগণ্ডসময়ে পুংশুদ্ধিতঃ সঙ্গমঃ॥

অর্থাৎ রবি, চন্দ্র ও লগ্ন পাপগ্রহযুক্ত বা পাপমধ্যগত হইবে না, উহাদের সপ্তমে পাপ থাকিবে না, অষ্টমে মঙ্গল বা চতুর্থে পাপযুক্ত হইবে না, কেন্দ্র ত্রিকোণ ও চন্দ্রে শুভযুক্ত হইবে, তৃতীয় ষষ্ঠ ও একাদশে পাপগ্রহ থাকিবে। এইরূপ লগ্নে যুগ্মরাত্রে গণ্ড নক্ষত্র ত্যাগ করিয়া পুরুষের চন্দ্র ও তারাশুদ্ধি থাকিলে গর্ভাধান প্রশস্ত।

জ্যোতিষশাস্ত্রের সহায়তায় পুত্র বা কন্যা কি হইবে, তাহা জানিবার উপায় বলা হইল।

অবশ্য আধানকাল যদি কেহ লক্ষ্য না রাখেন, তাহা হইলে কিছুই নির্ণয় করা চলে না। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে অনেকে নিষেককাল লিখিয়া রাখিয়া, তাহা লইয়া ইহার গবেষণায় নিযুক্ত হইয়াছেন, এ সংবাদ আমার আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় ইতিপূর্ব্বে যে প্রবন্ধ এখানে পাঠ করেন, তাহাতে আপনারা জ্ঞাত আছেন। আমাদের দেশবাসিগণ যদি জড়বাদীদের "Birth by accident—জন্মটা হঠাৎ হইয়া গিয়াছে" এই মত ত্যাগ করিয়া, আমাদের প্রাচীনতম "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" এই মত গ্রহণ করেন, তাহা হইলে দেশের কল্যাণ হইতে পারে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সন্তান কামনা করিতেন, সন্তান প্রাপ্তির জন্য তপস্যা করিতেন, তাঁহারা বর্ত্তমান যুগের কামজ সন্তান চাহিতেন না। তাঁহাদের বংশধরগণ তাঁহাদের উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহাদের পরবর্ত্তী বংশধরগণের উপর বর্ত্তমানের জড়বাদীদের প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে ও হইতেছে। তবে আমরা যে আজও সময় সময় অন্তর্মুখী হইবার চেষ্টা করি, ইহার কারণ আর কিছু নয়, উহা সেই অতিপুরাতন পূর্ব্বপুরুষগণের যে ভাবধারা বংশপরম্পরায় কিছু না কিছু রহিয়া গিয়াছে, তাহারই সাময়িক বিকাশ মাত্র। এখনও যদি আমরা পুনর্ব্বার আমাদের পূর্ব্বভাবধারা গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের জাতির ও দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে। বর্ত্তমানে আমরা কামজ সন্তান উৎপাদন করিতেছি। বস্তুতঃই "আমার সুসন্তান হউক" এই কামনা লইয়া সন্তান উৎপাদন করি না, পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সময় সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারই ফলে দেশের এই উচ্ছৃঙ্খলতা। তবে অজ্ঞাতসারে শুভ লগ্নে দুই একটী লোক জন্মায়—তাহারাই বিখ্যাত, ভাগ্যবান্, গুণবান্ বলিয়া পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠালাভ করে। কেহ বলিতে পারেন, পাশ্চাত্য জাতিগণও তো জড়বাদী, তাহারাও তো বিলাসে আকণ্ঠ নিমগ্ন, তাহারাই বা তবে বড় কেন? ইহার উত্তর বড় সোজা। তাহারা নবদীপ্ত জাতি। তাহাদের কাম্য—ঐশ্বর্য্য, বিলাস, প্রভুত্ব। তাহারা তাহারই সাধনায় নিমগ্ন। ইহার জন্য তাহারা উৎসাহশক্তি-সম্পন্ন, তাহারা অলস নয়। তারপর নবীন জাতির শক্তি উৎসাহ প্রখর, তাই তাহারা এখনও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। কোথায় কিছুর অভাব ঘটিলে তাহাদের উৎসাহশক্তির গুণে সে অভাব দূর হইয়া যাইতেছে। আজ তাহারা সৎসন্তানাদির জন্মের জন্য লালায়িত না থাকিলেও তাহাদের সন্তানগণ আমাদের সন্তানাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতেছে। তাহার কারণ এই যে, যেমন মানবের ভাগ্যচক্রে এক একবার শুভ সময় দেখা দেয়, সেইরূপ ঐ নবীন অভ্যুদয়সম্পন্ন জাতির ভাগ্যচক্রে এখন সুসময়; তাহারই ফলে উহাদের অধিক পরিমাণে সন্তান সন্ততি আমাদের সন্তানাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া উৎকর্ষ লাভ করিতেছে।

এখন আমাদের কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে সেই সাধনা, যাহার সাহায্যে আমাদের ভাগ্যগগনে শুভগ্রহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি। এই সাধনার একমাত্র পথ, সৎপ্রজার উৎপাদন। প্রাচীন কালের যে সকল উপাখ্যান আমরা পুরাণাদি শাস্ত্রে পড়ি, আমরা তাহা ঠিক উপলব্ধি

করিতে পারি না। আমাদের দুরবস্থা মোচন করিতে চেষ্টা পাই না। আমরা পুরাণে দেখিতে পাই, একজন তাপস তপস্যা করিলেন, তাহার ফলে তিনি অসাধ্য সাধন করিলেন। অর্থাৎ তিনি গভীর তপস্যায় এমন এক সত্যের আবিষ্কার করিলেন, সেই সত্য তাঁহার সমাজে প্রচার করিলেন, সেই সত্য তাঁহার সমাজে গ্রহণ করিল, তাহাব ফলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইল, আর প্রচার হইল—অমুক তপস্যার দ্বারা অপূর্ব্ব সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। যিনি কোন এক ছোট বা বড় মত বা সত্য আবিষ্কার করেন এবং তাহার প্রভাব তাঁহার আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত ফলবান্ থাকে, তিনিই অবতার বা অংশাবতার হইয়া থাকেন। তাহার প্রমাণ আমরা বর্ত্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধী হইতেই পাইতেছি। তিনি একটি মত এমন ভাবে প্রচার করিলেন, যাহার প্রভাব সারা মানবমধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহারই ফলে আজ তাঁহাকে মহাত্মা মহামানব আখ্যা দিয়াছে। তিনি তাঁহার মতবাদ যদি সমান বেগে চালাইতে পারিতেন, তিনি অবতার আখ্যায় ভূষিত হইয়া থাকিতেন। তবে যেটুকু করিয়াছেন, তাহাতে হয় তো পরশু-রামের মত অংশাবতার-বাদ তাঁহার থাকিয়া যাইবে। সে কালে এক ঋষি দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া সাধন দ্বারা এমন সন্তান উৎপাদন করিতেন, এবং তাঁহার সম্প্রদায় তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইয়া সুসন্তান উৎপাদন করিতেন, যাহার প্রভাবে দেশের দুর্দ্দশা দূরীভূত হইত। তাই বলিতেছিলাম, এখন আমাদের দেশে সৎপ্রজার আবশ্যক—যাহাদেব পদার্পণে দেশে স্বর্গীয় সুরভি আপনি প্রবাহিত হইবে। ঐ সৎপ্রজার উৎপাদনের মালমসলা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের হাতে তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। এখন আমাদের কর্ত্তব্য, তাঁহাদের প্রদত্ত দ্রব্যের সদ্ব্যবহার করা। আমাদের জাতি এখন দুর্ব্বল, উৎসাহহীন; তাহাকে সজীব করিতে হইলে যদি এক হাজার লোক সৎপ্রজালাভের সাধনা করেন, তাহা হইলে হয় তো একশত সৎপ্রজা জন্মগ্রহণ করিতে পারে। এই এক শত অকামজ সৎপ্রজা যদি একবার জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে হাজার হাজার সুসন্তানে দেশ পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে, দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, দেশের দৈন্য দুর্দ্দশা চলিয়া যাইবে।

আমরা সকলে দুর্ব্বল, কামনায় জর্জ্জরীভূত; তাই আমরা আমাদের শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করি না বলিয়াই আমরা দুঃখে কষ্টে ত্রাহি ত্রাহি রবে কোনও রূপে দেহভার বহন করিতেছি। আমরা যদি একটু সংযমী হইবার চেষ্টা করি, একটু সাধনা করি, তাহা হইলে আমরা আমাদের জাতির, আমাদের দেশের কিছু না কিছু উপকার করিয়াই যাইতে পারি।

এখন উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, যাঁহারা উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলিবেন, তাঁহারা চলিবেনই। তাঁহারা তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খলতায় যে জীবজগতে কতদূর বিশৃঙ্খলা আনিতেছেন, তাহা তাঁহারা দেখিতে বা ভাবিতে রাজী নন! তাঁহাদের উৎপাতে যে জীব সংসারে আসিয়া পড়ে, তাহার প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য কতখানি, তাহাও তাঁহারা ফিরিয়া দেখেন না। এই জাতীয় জীবগণকে কিছু বলিবার নাই। আমাদের শাস্ত্রে অবাধে বিচরণ করিতে একেবারে নিষেধ করিতেছে না, ঋতুকাল বাদ দিয়া এবং গর্ভধারণক্ষম ঋতু ব্যতীত ঋতুতে অবাধ উপভোগ

বাধা দেয় না। তবে গর্ভধারণক্ষম ঋতুতে অবাধগতি সর্ব্বদা উপভোগের উপযুক্ত নয় বলিয়াছে। যদি কেহ ঐ সময়ে সমীরণা নাড়ী বুঝিয়া চলিতে পারেন, তাহার পক্ষে বাধা নাই, কেবল গৌরী ও চান্দ্রমসী নাড়ীতে যথেচ্ছ উপগত হইলে গর্ভধারণ হয়; সুতরাং সন্তান প্রার্থনা-বিহীন নরনারীকে ঐ সময়ের জন্য সংযম রক্ষা করিতে বলা হইয়াছে। এইটুকু বাধা শাস্ত্র দিতেছে, গর্ভরোধ বিষয়ে জ্যোতিষশাস্ত্রের হাত এই পর্য্যন্ত। সন্তানজনন বিষয়ে গর্ভধারণক্ষম ঋতুতে গর্ভাধানবিহিত কালে ঋতুরক্ষা করিলে সুসন্তান সুসন্ততি পিতামাতার ইচ্ছাধীন। বিশেষ গৌরী ও চান্দ্রমসী নাড়ী বুঝিয়া চলিতে পারিলে উহা আরও সহজ হইয়া যায়। তারপর বিশেষ সৎসন্তানসন্ততি কামনা করিলে তাহাদের জন্য বিশেষ সংযম সহকারে জ্যোতিষাদি শাস্ত্রের সমস্ত বিধিনিষেধ পালন করিয়া উপযুক্ত গর্ভাধান লগ্নে নিষেক আবশ্যক। ইহা সহজসাধ্য নহে। তবে জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত গর্ভনিরোধ ও স্বেচ্ছাধীন সন্তান সন্ততির উৎপাদন কষ্টসাধ্য নয়। এক্ষণে জ্যোতিষশাস্ত্র প্রজানিয়মনে ও সুপ্রজাবর্দ্ধনে কিরূপ ও কতদূর মানবের সহায়তা করিতে পারে, তাহার মোটামুটি হিসাব দেখান হইল। ইহা প্রত্যক্ষ বিদ্যা, সুতরাং ব্যবহার দ্বারা ইহার দোষগুণ নিরূপিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

শ্রীগণপতি সরকার

বীরভূমের প্রাদেশিক শব্দসংগ্রহ

গৃহস্থালী

আখা—উনন, চুল্লী।

উঁপুল—ঘুঁটে।

ওড়োং—নারিকেলের মালা-নির্ম্মিত হাতা, গরম দুধ নাড়িবার জন্য ব্যবহৃত।

ওঁতা'ল্—আবর্জ্জনা, Sweepings.

কানি—নেকড়া, ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড।

কাঁথ্‌রা—ভগ্ন গৃহ।

গোঁজা—জঞ্জাল, আবর্জ্জনা।

ঘসি—ঘুঁটে।

ছামু—সম্মুখভাগ।

জোলুই—পেরেক।

ঠেঙা—লাঠি।

ডামাল, দামাল—সুপুষ্ট শিশু।

নেতা'ড়্—নানা দ্রব্যে পরস্পর সংলগ্ন থাকা, জোড়াজুড়ি।

পাউঠি—সিঁড়ি, পাদপীঠিকা।

পাঁদা'ড়্—গৃহের পশ্চাদ্‌ভাগ।

বেনা—হাতপাখা, ব্যজন।

নাছ, নাচ দুঅর, লাচ দুঅর,—বহির্দ্বার, বহির্দ্বারের সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র অঙ্গন। পৌষ মাসে এই অঙ্গন মার্জ্জিত হয় এবং ধানের গাড়ী এই স্থানে রাখিয়া তাহা হইতে ধান নামাইয়া লওয়া হয়।

গুদড়ি—ছিন্ন কন্থা।

ডাবোর্—বড় বাটি।

ডাবুরি—বড় বাটি।

তিউরী—উনন।

ধানকাঠ—চৌকাঠের নিম্নস্থিত ভূ-সংলগ্ন কাষ্ঠ-খণ্ড।

দিব্‌গাছা—দীপবৃক্ষ, দের্‌খো, 'পিলসুজ' শব্দও ব্যবহৃত হয়।

নুতো—তামাক খাইবার জন্য খড়ের গুটি (ball) প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। এই খড়ের গুটিকে 'নুতো' বলে।

দোনা—মৃত্তিকানির্ম্মিত সুবৃহৎ প্রশস্তমুখ পাত্র; এই পাত্রে গরুকে জাব খাইতে দেওয়া হয়। ['দ্রোণ' শব্দজ ?]

পাৎনা—অতি বৃহৎ প্রশস্তমুখ মৃন্ময় পাত্র। ইহাতে ধান ভিজাইয়া রাখা হয়।

গোরা—জালা, সঙ্কীর্ণমুখ বৃহৎ পাত্র। গৃহাভ্যন্তরে এই পাত্র তণ্ডুলাদি রাখিবার জন্য রক্ষিত হয়।

থেলানি—হাঁড়ি, সঙ্কীর্ণমুখ মৃন্ময় রন্ধনপাত্র।

তোলো—অপেক্ষাকৃত বৃহৎ মৃন্ময় রন্ধনপাত্র।

মালসা—প্রশস্তমুখ মৃন্ময় রন্ধনপাত্র।

ফাওড়া—দণ্ডায়মান অবস্থায় মাটি কাটিবার জন্য দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ডসম্বলিত কুদ্দাল-বিশেষ।

কুটুরি—প্রশস্তমুখ প্রস্তরপাত্র।

খোরা—প্রশস্তমুখ কাংস্যপাত্র।

চুমকি—কাংস্যনির্ম্মিত জলপানপাত্র। ['চুম্বন' শব্দের সগোত্র শব্দ ?]

পাথ্‌রা—প্রস্তরের থালা।

পাথুরি—প্রস্তরের বাটি।

মাঙ্গলি—গোবোর জল দিয়া নিকানো মণ্ডলাকার স্থান। প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রত্যেক দ্বারে ও তুলসীতলায় 'মাঙ্গলি' দেওয়া গৃহস্থবধূর দৈনন্দিন কার্য্য। [মণ্ডলী-শব্দজ]

কৃষি

আঁকুশী—আকষী, বৃক্ষ হইতে ফল পাড়িবার জন্য দীর্ঘ বংশদণ্ড।

আবোর গরু—হল চালনা বা শকট চালনায় অশিক্ষিত অল্পবয়স্ক গরু।

ইলেম্—নির্দ্দিষ্ট দৈনিক মজুরীর উপরে যাহা মজুর বা কৃষাণকে প্রদত্ত হয়, পুরস্কার।

কয়া চা'ল—লোহিতাভ চাউল।

কেদে—কাস্তে।

কোঁঞলা বাছুর—ছোট বকনা বাছুর।

খাবুটে গরু—যে গরু খুব খায়, বাছাবাছি করে না।

গুশিঞ্‌ঞে—গো-মহিষাদির স্বামী বা মালিককে 'গুশিঞ্‌ঞে' বলা হয়। 'গুরু' শব্দ সাধারণতঃ এই শব্দের সহিত যোজিত হয়। 'এটোর কি গুরু গুশিঞ্‌ঞে কেউ নাই ?'

জোল—জলাভূমি, নিম্নভূমি, যেখানে ধান্যক্ষেত্রে ধান পাকিয়া গেলেও জল মরে না। জোলের মাঠ, জোল জমি প্রভৃতি শব্দও প্রচলিত। বীরভূমের বেদেরা যে শিবের গান গাহিয়া বেড়ায়, তাহাতে আছে—"মাঠ জোল ভাসিঁঞে এল, নদী পদ্মাবতী।"

ডাংরানো—গরু বা মহিষকে অতিরিক্ত প্রহার করা।

ঢেলা—হলকর্ষণের পর মই দিয়া জমির 'ঢেলা' ভাঙ্গিতে হয়।

থানা—শসা, কুমড়া প্রভৃতি বীজ পুঁতিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট গোলাকৃতি স্থান। অঙ্কুরোদ্‌গমের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত 'থানা' সরস রাখিতে হয়।

দবজা গরু—রুগ্ন বা বৃদ্ধ এবং অপটু গরু।

পলানো—উঠান কাটিয়া কাদা করিয়া তাহা শুকাইলে পিটাইয়া শক্ত করা হয়। ধান্য কাটিবার পূর্ব্বে উঠানের এই সংস্কারকার্য্য আবশ্যক, নতুবা ধান্যের অপচয় হইবে। এইরূপ সংস্কারকার্য্যকে 'আগ্‌নে (অঙ্গন) পলানো' বলে।

বীচন, বেচন—বীজ, ধান্যের চারাগাছ।

গিরিকচিরিক—যে গরু বাছিয়া বাছিয়া অত্যল্প খায়। বিপরীত শব্দ 'খাবুটে'।

শোঁপ্‌রে—লঙ্কা।

শোঁদা—কাটারী।

আগোল বাঁধ—শস্যক্ষেত্রে পশুপ্রবেশ নিবারণের ব্যবস্থা, প্রহরী নিয়োগ ও বেড়াবাঁধা, তত্ত্বাবধান।

আছাল—পশলা, 'এক আছাল বৃষ্টি।'

আদাড়—ঝোঁপ, ছায়াযুক্ত দুর্গম ঝোঁপ, যেমন 'বাঁশ আদাড়'।

খুঁচি—মাপবিশেষ, এক সেরের অষ্টমাংস, অর্দ্ধ পোআ।

খোঁটোর, খোঁদোর—কোটর, গহ্বর, বৃক্ষকোটর, শৃগালাদির বাসস্থান।

ঘোশুরে ঘোশুরে—ঘর্ষণ করিয়া।

ঘষ্টানি—ঘর্ষণ, মৃদু ঘর্ষণ।

চরাট—চরিয়া ঘাস খাওয়া, গোচর স্থান।

চোটাল মুনিষ—কর্ম্মঠ ও সুপটু মজুর।

চ'ড়্—নীচ জাতি, ঘৃণিত জাতি, চোয়াড়।

ছয়লাপ—অপচয়, অত্যধিক অপচয়।

ঘুণানো—ঘুণবৎ বৃষ্টিপাত, 'দেবতা ঘুণোইছে', ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু পড়িতেছে।

ঝিমেনি—মৃদু বৃষ্টিপাত, 'দেবতা ঝিমেইছে'—মৃদু বারিপাত হইতেছে।

কাড়ান্—অধিক বৃষ্টিপাত, কৃষির জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত। 'কাড়ান্' হইলে শস্যক্ষেত্রের উপর জলপ্রবাহ হয়।

উঠোনি—কাড়ানের সময় পুকুর হইতে কই, মাগুর প্রভৃতি মাছ উঠিয়া আইসে। এইরূপ মাছ উঠাকে 'উঠোনি' বলে।

গোঙাল—ক্ষেত্রের জল বাহির হইয়া যাইবার জন্য গুপ্ত সুড়ঙ্গ।

গো-ভাগাড়—মৃত পশু নিক্ষেপের স্থান।

টেকোর্—জমির উচ্চ স্থান, 'টেকোরে জল ছাড়্লে সব জমিতে ছিঁচ পায়'।

তেউরি—কলাগাছের চারা, উদ্গত অঙ্কুর।

নামাল্—নিম্নভূমি।

লিট্‌পিটে—দীর্ঘসূত্রী।

দুনী—জলসেচন-পাত্র।

পয়মাল—শস্যক্ষেত্র পদদলিত করা, 'গরু ছেড়ে দিঞে আমার তিন বিঘে জমির ধান পয়মাল করেছে'।

প'ল্—পোআল্, বিকীর্ণ খড়, 'পলাল' শব্দজ।

পৌঠি—ধানের মাপবিশেষ। পাঁচ মণে এক বিশ, ষোল বিশে এক পৌঠি।

বোরুই—পানের বাড়ী।

বা'গ্‌রো, বাগুরো—তাল বা কলাগাছের পত্রের দণ্ড। [কঙ্কল — বকল — বাকল — *বাগরঅ — বাগ্‌রো বা বাগুরো]

লীগ—গাড়ীর লীগ, মাঠে গাড়ী চলিয়া গেলে মাটি কাটিয়া যে চাকার দাগ পড়ে, তাহাকে 'লীগ' বলে। 'গাড়ীর লীগ ধোরে ধোরে চোলে যাবি'।

শরান্—প্রশস্ত রাজপথ।

শামাল—উধঃ, পালান, আপীন। 'গাইটোর শামাল্ নামে না।'

মানুষ

অপয়া—অলক্ষণযুক্ত, অলক্ষণা।

আপ্তসারা, আপ্তসুখী—আত্মসুখমাত্রে তৃপ্ত, অপরের সুখ দুঃখে উদাসীন।

আ-বাগা মানুষ—যে লোক কাহারও কথা শুনে না, নিজের মতানুযায়ী কার্য্য করে।

উদো মাদা লোক—সাদা সিধা লোক।

কাঠ খোট্টা—বিজাতীয় ও অদমনীয়।

চেরোলদাঁতী—গালিবিশেষ, ব্যাঘ্রদন্তী।

ছেব্‌লা—নির্ব্বোধ [কিন্তু প্রা°-ছবিল্ল = পণ্ডিত]

ইলছে—ধৃষ্ট।

উদম্—অনাবৃত [উদ্দাম]।

উব্বান—বমন।

গাহাক—গ্রাহক, খরিদদার।

গোশা—দাম্পত্য অভিমান ['গুস্‌সা']।

জেঠুই—জ্যেষ্ঠতাতপত্নী।

মাউই—ভ্রাতা বা ভগিনীর শাশুড়ী।

কয়েশ্—চোয়াল, 'কয়েশের দাঁত'।

খিট্‌কেলো—অপবাদ, নিন্দা।

ডাঁফালো—বর্দ্ধনশীল, "ডাঁফালো বিটি ছেলে"।

ডোবো গাল—মাংসল গণ্ডস্থল।

ডোমো ডোমা—ফুলা ফুলা।

ঢিট্‌পিটে—দীর্ঘসূত্রী।

ঢুথিয়ে—নীচ, হীন।

ধাষ্ট্যামি—ধৃষ্টতা, বৃথা কথা কাটাকাটি।

তকোল্লোবি—সত্য গোপনপূর্ব্বক প্রতারণা [পারসী]।

তাক্ তুক্—কার্য্যসিদ্ধির অনুকূল ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান।

তুতিঞে বাতিঞে—মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া। 'বিটিকে তুতিঞে বাতিঞে পাঠিঞে দেগা; জামাইকে চটাস্ নে।'

নাকানি চুবোনি—অপ্রতিভত্ব। 'তাকে নাকানি-চুবোনি খঁ'ঞে ছেড়ে দিঞেছে।' অর্থাৎ অত্যন্ত অপ্রতিভ করিয়াছে।

লটঘটি—কেলেঙ্কারী, কলঙ্ক। [নটঘটি]

তেরিমেরি করা—ক্রোধব্যঞ্জক ভাষা। 'আমি যেতেই তেরি-মেরি কোরে এ'ল।' [হিন্দী]।

থাঁতাইল্—বহুবিধ কার্য্যের ভিঁড়।

ধাউৎথরা—রুক্ষতাজন্য রোগবিশেষ, মেহ-রোগ। [ধাতু+খরা]।

ধাদোশ্—অসমর্থ ব্যক্তির যন্ত্রচালিতবৎ কর্ম্ম-শীলতা, "ধাদোশে ঘুর্‌ছি ফির্‌ছি, আমার শরীরে কিছু আছে?"

খুঁট্-আঁকুবে—ছিদ্রান্বেষী।

গিদের—বালকসুলভ অহঙ্কার প্রকাশ।

গেঁড়া—খর্ব্বকায়।

গোঞ—নারাজ।

গোঁতা—লজ্জাশীল।

ঘবামি—গৃহছাদনকারী মজুর।

ঘস্‌সোর, ঘেস্‌সোর্—অপরিষ্কৃত, নোংরা। [ঘস্মব]।

ঘুড়্‌কো—বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার সাহায্যকারী বালক।

পেকাম্বর—বৃথা অহঙ্কারী। [পয়গম্বর]।

বাল্টুরে—খর্ব্ব, বামনাকার।

বড়াং—বড়াই, গর্ব্ব।

বব্‌বোলে—যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। 'গঙ্গা জলে, বব্‌বোলে'।

ফোকোশ্—ডাইনী।

মোনোক্তোর—পছন্দ।

শাউকর—বিদ্রূপাত্মক শব্দ, আক্ষরিক অর্থ 'দানশীল'। ব্যঞ্জনালব্ধ অর্থ 'কৃপণ'। [সাধুকার]।

হুপয়্—ভীতিজনক দেশব্যাপী গুজব।

হেদিঁঞে য—প্রিয় ব্যক্তির অদর্শনজন্য শিশুর মানসিক পীড়া হওয়া।

লেওটো—"ছেলেটো আমার বড্ড লেওটো" = ছেলেটা আমার কাছ ছাড়া থাকিতে পারে না।

চ্যাঁদোর—প্রবঞ্চনাবুদ্ধিপ্রবণ।

চোকোল্‌খোর—নিমক্‌হারাম, অকৃতজ্ঞ।

ছ্যাব্‌লা—নির্ব্বোধ।

মুরদ—পুরুষত্ব, বীরত্ব। "ঝাঁক পাঁচ ছয় জল ছিঁচে কোমরে দিলে হাত। এই মুরদে খাবা তুমি বা'গ্‌তেনীর ভাত॥" —শিবের গান।

ছেঁচোর—নীচাশয়, হীন-প্রকৃতি।

ছোঁচা—লোভী।

ঝুঁটি—খোঁপা, কবরী।

হাতের চোটো—করতল।

চাড়্—চেষ্টা।

চেঠা—চেষ্টা, উত্তম।
চিকি—কৃপণ।
ঠেঁটা—ধৃষ্ট।
ডোঙো—অবিবাহিত চঞ্চল স্বভাব যুবক।
ডোখ্‌লা—লোভী।
তঞ্চোক্—প্রবঞ্চনা।
তায়েন্—খেয়াল।
থুবড়ো—বিবাহযোগ্য বয়সে অবিবাহিতা কন্যা।
পেকাম—বৃথাভিমানী। [পয়গম্বর]।
ফিচ্‌কেল—জটিল-চরিত্র।
ব্যাত—মুখগহ্বর। 'হাতে-ব্যাতে ঠিক থাক্‌লে আঁধারে ভাত খায়।'
ব্যাদোর—অপরিষ্কৃত।
ভাইজ্—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী।
ভাউই—কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী।
ভোঁশা——বিশাল বপুবিশিষ্ট বুদ্ধিহীন ব্যক্তি।
মোড়ে—খর্ব্বকায় দুর্ব্বল ব্যক্তি।
শঁক-শঁকানি—কৃতিত্বাভিমান।
শাঁন—ঘোমটা।
হাবুচাবু—থতোমতো।
লেরোল্—ললাট।
পীলুই—প্লীহা, প্লীহারোগ।
জাং—জঙ্ঘা।
হোঁটো—হাঁটু।
গুঁড়ুলি—গোড়ালি।
পাইট-করাণী—দাসী, ঝি।
ধেঙোর্—পার্ব্বত্য জাতিবিশেষ।
লেট্—নিম্নজাতীয় হিন্দু। ইহারা সাধারণতঃ কৃষাণের কার্য্য করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে।
কিষেন্—কৃষাণ।
মাইন্দের—মাহিয়ানাদার, ভৃত্য। ইহারা বৎসর-চুক্তিতে বেতন পায়।
মোছল্—মৎস্য শিকারে পটু ব্যক্তি।
গোছল্—বৃক্ষারোহণে পটু ব্যক্তি।
আঁটকুরো—নির্ব্বংশ।
ছিতুশ্, ছেতোশ্—অনুভবের আধিক্য, স্নায়বিকতা, অসহনীয়তা।
ছিতুশে লোক—সামান্য অসুখে স্নায়বিক উত্তেজনাবশতঃ যে ব্যক্তি অধিক কাল রোগ ভোগ করে। যাহার ক্ষতাদি সহজে আরোগ্য হয় না। 'এমন ছিতুশে' লোক যে একটো কাঁটা ভুঁক্‌লে ছ মাস পড়ে' থাকে।"

কাল

আমুতী—অম্বুবাচী।
ওশুজ্—অশৌচ।
আকাবাকি—তাড়াতাড়ি।
আফ্‌সাব্—সচরাচর। [আকসর্]।
জাড়ের দিন—শীতকাল।
খরা—গ্রীষ্মকাল।
বাইর্‌শে—বর্ষাকাল।
ডাওর্—বাদলা।
চট্ কোরে, চপ্ কোরে, ঝপ্ কোরে—সত্বরতার সহিত।
উঠনি—বৃষ্টির সময় মাছ-উঠা।
বন্দেজ্—সময়ানুযায়ী দ্রব্য সরবরাহের বন্দোবস্ত।
বাওর্—বাতাস।
ঝোড়্—ঝড়।
বিয়েন্ বেলা—প্রাতঃকাল।
সঞ্জা বেলা—সন্ধ্যাকাল।
সঞ্জা বাঁউরে এল—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল।

জল খাবার বেলা—আন্দাজ ১০টার সময়।
পরোব্ পাইল্—পূজা পার্ব্বণ, উৎসবাদি।
লবান্—নবান্ন উৎসব।
সোমোস্তো বয়েস—যৌবনকাল। [সমর্থ বয়স]।
জেওর—শিশির।
ভাতবেলা—আহারের সময়।
শিঁয়েন্ বেলা—স্নানের কাল।
ঘুব্‌ঘুট্টি আঁধার—সূচিভেদ্য অন্ধকার।
আমাবোশে—অমাবস্যা।
কাতি—কার্ত্তিক মাস।
জোনাক রা'ত্—জ্যোৎস্না রাত্রি।
জোনাকে ফিং ফুট্‌ছে—জ্যোৎস্নালোকের প্রাচুর্য্য।

বেশভূষা

আঙ্‌টি—অঙ্গুরীয়।
কাঁক্‌নী—রৌপ্য-গ্রথিত কঙ্কন।
উদম্—অনাবৃত, নগ্ন।
গিলিপ্—ওয়াড়। [পারসী 'গিলাফ']।
গুদুড়ি—ছিন্ন কন্থা, ছিন্ন ও জীর্ণ বস্ত্র। [পোর্ত্তুগীজ—গোদ্রিম্]
ঝুঁটি—কবরী।
কানি—বস্ত্রের খণ্ডিতাংশ, নেকড়া।
চহোট্ট—চাকচিক্য, আভিজাত্যাভিমান।
চাবৃকী—ঘুন্‌সি।
ভ্যাক্, ভেক—ভৈক্ষ্য, ভিখারীর বেশ।
শাঁন—ঘোমটা, মুখাবরণ।
মালা তিলক—বৈষ্ণবের বেশ।
মালা চন্দন—বৈষ্ণবের সংস্কার।
খাড়ু—রৌপ্যবলয়বিশেষ।
হাঁসুলি—রৌপ্যহার।
পাউয়ো—মল, রৌপ্যনির্ম্মিত পাদাভরণ।
ফেরানি—বালিকার পরিধেয় ক্ষুদ্র সমচতুষ্কোণ বস্ত্র।
বাজু—রৌপ্য-গ্রথিত বাহুবলয়।
দোলাই—বালক বালিকার শীতবস্ত্রবিশেষ।
বিন্দেবুনী—বৃন্দাবন হইতে আগত ছাপান পা'ড়বিশিষ্ট বস্ত্র বা শাড়ী।
নীলাম্বরী, লীলাম্বরী—নীল সাড়ী।
ডোর—ঘুনসী।
ডোর কোপিন্—বৈষ্ণবের বেশ।
জ্যাব—পকেট। [পারসী 'জেব']।

ফল ও উদ্ভিদ

আম শোঁপ্‌রে—পেয়ারা। [সফরী আম]।
আঁকোড়—অঙ্কোল্ল, কণ্টকবৃক্ষবিশেষ।
কুঁড়াচি—কুটজ পুষ্প বা বৃক্ষ। ইহার ফলকে 'বাঁদোর লাঠি' বলে।
গব্‌গো'রে—শরজাতীয় ক্ষুদ্র উদ্ভিদবিশেষ। 'কুসুমবীজ'সদৃশ ফল।
কাঁইবীচ—তেঁতুলবীজ।
তেউর, তেউরি—কদলীবৃক্ষের চারা।
লাটা, নাটা—বিষাক্ত কণ্টকলতাবিশেষ।
নামাড়্—বটবৃক্ষের শূন্যবিলম্বিত শিকড়।
থকা, থোপা—স্তবক, কাঁদি।
ধ'—বৃক্ষবিশেষ। ইহার আঁঠা দিয়া ব্রাহ্মণেরা পৈতা পরিষ্কার করেন।
ডুঁকলি—জলে ভাসমান উদ্ভিদবিশেষ, পানা।
বেচোন—ধান্যের চারা, যাহা এক জমি হইতে তুলিয়া লইয়া অন্য জমিতে পুতিতে হয়।
শিয়েল কুল—অতি ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণ কুল, শেয়াকুল। কণ্টকবৃক্ষবিশেষ।
চৌকা—খোসা, ফলের গাত্রবল্ক।

কোষো—কাঁচা, কষায়াস্বাদবিশিষ্ট ফল।

ডিংলে—কুমড়া।

থানা—শসা প্রভৃতির বীজ বপনের জন্য নির্দ্দিষ্ট মণ্ডলাকার সরস স্থান।

শোঁপরে—লঙ্কা।

বাঙী—ফুটিবিশেষ।

কেঁদ্—আবলুস গাছের ফল।

মাঁরবা—শসাবিশেষ।

রাখাল কেঁদুরী—আরণ্য লতাজাত ফলবিশেষ। স্থানান্তরে ইহাকে 'রাখালশসা' বলে।

ঘি কল্লা—মিষ্ট করলা, কাঁকরোল।

বড়াল—ডেয়াফল।

মাঁদার— ঐ ।

লেওর্ জালি—নীহার বা শিশিরপাতে শসা প্রভৃতির যে ফলোদ্গম হয়, তাহাকে 'লেওর্-জালি' বলে।

খাদ্য-দ্রব্য

আ'র্শে—অপূপবিশেষ।

আমোট—হিন্দী 'অমাবট' শব্দজাত। আমসত্ব।

আমানি (কাঁজি) সাঁতোলা—গ্রীষ্মকালে ডা'লের পরিবর্ত্তে 'আমানি সাঁতোলা' ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তৈল, লবণ, হরিদ্রা, পানিফলপত্র ও সরিষা ইহার উপকরণ।

খোয়েনো—খই বাছিয়া লইবার পর তুষাবরণ-মধ্যস্থ যে শক্ত খইগুলি পড়িয়া থাকে, তাহা ঢেঁকিতে কুটিয়া ছাতু প্রস্তুত হয়। ঐ শক্ত তুষমধ্যস্থ খইকে 'খোয়েনো' বলে। প্রস্তুত ছাতুকেও 'খোয়েনো' বা 'খোয়েনোর ছাতু' বলে।

উথ্‌রো—মুড়কী।

খাজারি—মুড়ি। [সাঁওতালী 'খেজেরি']।

পেটেলি—গুড়ের চাকৃতি, পাটালি।

ভাজা-তোলা—নানাবিধ ভৃষ্ট তরকারি।

সিঝে পোড়া—সিদ্ধ ও দগ্ধ, যেমন আলুভাতে ও বেগুনপোড়া। সংক্ষিপ্ত রন্ধন।

চেকা—অম্লাস্বাদ।

পুআ—অপূপ।

লবান্—নবান্ন।

মলান—মৃণাল। পদ্মডাঁটার ভূগভস্থ শুভ্র অংশ। নিম্নজাতীয় বালক বালিকাগণ পুষ্করিণীর পাঁক হইতে 'মলান' তুলিয়া খায়।

ভেঁইট্—পাকা শালুক ফল। ইহার মধ্যস্থ সর্ষপবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজগুলিকে ভাজিলে লঘুপাক খই প্রস্তুত হয়। পশ্চিমে এইরূপ খইএর মোআ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে।

ক্রিয়াপদ

আকাচাকা ভালা—মুগ্ধভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ।

আকাবাকি করা—সত্বরতা অবলম্বন করা।

আখালা—প্রক্ষালন করা।

আমুলে য'
আম্‌লিয়ে য' } টকিয়া যাওয়া।

আবুরে রাখা—যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দেওয়া।

কারে পড়া—বিপাকে পড়া।

উকুট'—অন্বেষণ করা।

উশ্‌কিএে দে—উত্তেজিত করা। [উৎ+শিখা]

ওলিয়ে য',—পড়া,—ক্লান্ত হওয়া। পচিয়া যাওয়া।

ছাঁটা—পদদলিত করা।

ঝিমে—মৃদু বৃষ্টিপাত। 'দেবতা ঝিমেইছে'।

কাজিয়ে করা—ঝগড়া করা।

কিরে করা—দিব্য করা, শপথ করা।

খচলান্ত করা—বিরক্ত করা।

খপ্ করা—সত্বরতা অবলম্বন করা।

খপ্ খপ্ করা—অনুশোচনা করা।

খপ্‌খপানি—পশ্চাত্তাপ।

খিটকেল করা—কুৎসিৎ নিন্দা করা, অপবাদ দেওয়া।

তেরিমেরি করা—ক্রোধ প্রকাশ করা।

তাগুরে রাখা—সঞ্চয় করা।

দাঁহুড়ে য'—রুচিপূর্ব্বক আহার করা, খাইবার সময় বাছ-বিচার না করা।

ধাঁতাল করা—নানাবিধ কার্য্যের জটিলতায় বিরক্তিকর কার্য্য করা।

ওতাল করা—আবর্জ্জনাপূর্ণ করা। অপরিষ্কার করা।

ঠুল'—লাফান,—"কি আনন্দ হ'ল রে ভাই, কি আনন্দ হ'ল। সুচির ওপর তালবড়া ঠুলইতে লাগিল॥"

তকোল্লবি করা—বিশ্বাসঘাতকতা করা।

তাকতুক করা—ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রাদি দ্বারা বশীভূত করা। বাহ্য ঔষধাদি প্রয়োগ দ্বারা বশীভূত করাকে 'ওষুদ করা' বলে।

তুত্তিঞে বাত্তিঞে কাজ করান—মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া মজুর খাটান।

খেল্লড়ে দে—তাড়াইয়া দেওয়া।

(পোখুর) গাবান—মাছ ধরিবার জন্য সমগ্র পুকুরের জল অপরিষ্কার করা।

গিদের করা—ছেলেকে আদর করা, অহঙ্কার করা।

ছেলে কা'না—ছড়া বলিয়া ছেলেকে ঘুম পাড়ান।

ঘাটকে য'—স্ত্রীলোকের ভাষা। মলত্যাগার্থ গৃহ হইতে নির্গমন।

বিগুরে য'—বিকৃত হওয়া। 'এমন বউ আনলে যি আমর সোনার ছেলে বিগুরে দিলে।'

ফোকোশে খ'—ডাইনীর প্রভাবাধীন করা। 'ছেলের জ্বালা ছাড়ে না, ফোকোশে খেঁঞেছে।'

কাঁটা ভোঁকা—কাঁটা ফোটা। 'পায়ে একটো কাঁটা ভুঁকেছে। আজ তিন দিন খচ্-খচ্ ক'রছে।'

ফরে আনা—কার্য্যোপযোগী করা। কার্য্যানুকূল করা। 'এত ক'রেও তাকে ফরে আ'নতে পা'রলাম না।'

পয়মাল করা—পদদলিত করা।

চকাস করা } ফরসা করা, মেঘ বা বাদলা
ধরণ করা } কাটিয়া যাওয়া।

ঝ্যাঁজকান—ঝ্যাঁক্ ঝ্যাঁক্ করা।

ফুঁকুলে য'—ফসকে যাওয়া।

হুলন—উচ্চস্বরে চীৎকার করা।

শাউকরি করা—উদারতার ভাণ করা।

হালা—কাঁপা। 'গরুটো জাড়ে হা'লছে।'

হেঁচোলা—অকস্মাৎ টান দেওয়া। 'দোয়ে বলদটো হিঁচুলে হিঁচুলে দড়ি ছিঁড়ুছে।' 'হেঁচোল মারা'—সহসা আকর্ষণ।

হেদ্দিঞে য'—অদর্শনে কাতর হওয়া। 'তিন দিন বাবাকে না দেখে ছেলেটো হেদ্দিঞে গেল।'

মোনোক্কর করা—পছন্দ করা।

মারুলি দে'—প্রাতঃকালে গোবর-জল দিয়া মণ্ডলাকার স্থান লেপন করা। প্রতি দ্বারে ও তুলসীতলায় মারুলি দিতে হয়।

ডাংড়ান—নৃশংসভাবে প্রহার করা।

ঢেরীকরা—স্তূপীকৃত করা।

তকরার করা—বাজী রাখা।

তিরিশ বিরিশ করা—বিরক্ত হওয়া।

দিক্ করা—বিরক্ত করা। [হিন্দী]।

দিশালাগা—দিগ্‌ভ্রম হওয়া।

নেতাড় লাগা—নানা দ্রব্যের পরস্পর সংলগ্ন হওয়া।

আগুনে পলান—জলকাদা করিয়া অঙ্গন সংস্কার।

পাশুরে য'—ভুলিয়া যাওয়া।

ফাবড়া—যষ্টি প্রভৃতি দীর্ঘ বস্তু নিক্ষেপ করা।

বাসা—দুর্গন্ধ উৎপন্ন হওয়া। 'একটো এঁদুর মোলছে, ভারি বাসাইছে।'

মালুক মারা—ডিগবাজী মারা।

জীবজন্তু

চাঁদকুরো—ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ।

কোউআ—কাক।

ডালকোউআ—দাঁড়কাক।

চ্যাং—ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ।

গচি—সর্পাকৃতি সূক্ষ্মমুখ মৎস্যবিশেষ।

গো-বাগা—নেকড়ে বাঘ।

খরিশ—গোখ্‌রো সাপ।

আলান—কৃষ্ণসর্প।

রুই—উইপোকা।

মিরিক—মৃগেল মৎস্য।

আঁধি—ফসলের অনিষ্টকর কীটবিশেষ।

পোলু—রেসম-কীট।

কাঁকুড়ী—কাঁকড়া।

কানকোটারি—কেন্নু।

সোনা গোদা—গোসাপ, স্বর্ণগোধিকা।

হনু—বানর।

শশা—খরগোশ।

কুকিল—কোকিল।

গুঠলী—এঁটুলি।

বিজি—নকুল, বেজি।

ক্রিয়াবিশেষণ

কোতি—কোথায়।

আকাবাকি—তাড়াতাড়ি।

আকাচাকা—বিস্মিতভাবে।

আফছার—সচরাচর, প্রায়ই। [পারসী 'অকসর']।

আনাই ধানাই } ধানাই পানাই } বৃথা কথা কাটাকাটি, অনর্থক সময়ক্ষেপণ।

ওমুন—বিনা মূল্যে।

আদা-খেঁচরা—অর্দ্ধসম্পূর্ণ।

খানোকা—অনর্থক, অকারণ।

কুনঠিঞে—কোথায়।

ফারাক্—দূরবর্ত্তী, দূরে।

হাকুচাবু—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়।

শোঁজাগুজি—সোজাসুজি।

নাফানাফি—লাফালাফি।

শ্রীগোরীহর মিত্র

জ্ঞান উৎপাদ[১]—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

জ্ঞান কি, বস্তুর সহিত মনের সম্বন্ধ, জ্ঞানের প্রকারভেদ আছে কি না, সত্য বা প্রমা জ্ঞান কি করিয়া হয়, প্রমিতিস্থলে প্রমাতা কাহাকে ধরা যায়, ভ্রমের স্থান কোথায়, এই সকল প্রশ্নের সমাধান মনস্তত্ত্ব অথবা তর্কশাস্ত্র দ্বারা হয় না। সেই জন্য জ্ঞান উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র তত্ত্বের আবশ্যকতা হইয়াছে এবং ইংরাজীতে উহাকে "এপিসটেমোলজি" বলে। তবে মনস্তত্ত্ব ও তর্কশাস্ত্র জ্ঞান উৎপত্তি বিচারে সাহচর্য্য করে, তাহা বলা আবশ্যক।

জ্ঞান প্রকৃতপ্রস্তাবে একাকী উৎপন্ন হয় না, ইহা জ্ঞেয়ের অর্থাৎ বস্তু বা বিষয়ের অপেক্ষা করে। যদি জগৎটা না থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয়, মানবজ্ঞান, নাগার্জ্জুনের শূন্যে পরিণত হইত এবং সংস্কার না থাকায় সকলেই বিনা সাধনায় নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারিত। পাঁচ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তুর সংবাদ আমরা পাইয়া থাকি, তাহা বহু প্রাচীন কাল হইতে মানুষ জানিয়াছে। মনোবিজ্ঞানে এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের স্থলে আরও কএকটি সংযুক্ত হইয়াছে—তাহারা সাধারণতঃ দৈহিক বা শারীর ক্রিয়ার অনুভূতি[২]। প্রাকৃতিক পদার্থের দ্বারা কোনও অজ্ঞাত নিয়মে এই ইন্দ্রিয়গুলি অভিহত হয় এবং তাহার ফলে বিভিন্ন সংবেদন হয়। সংবেদনসমূহ জাতি গুণ প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাপার লইয়া বস্তুগ্রহ বা উপলব্ধিতে (পারসেপ্‌শন্) পরিণত হয়। এখানেও কোন অপরিচিত নিয়মে উহা মানসিক আকার (আইডিয়া) প্রাপ্ত হয় ও উহা অবধৃত হইয়া সংস্কার (কন্‌সেপ্ট) আকারে মনোমধ্যে নিহিত থাকে এবং তাহাকে আমরা স্মৃতি বলি। *আধুনিক মনস্তত্ত্বের যেরূপ রীতি দাঁড়াইয়াছে,* তাহাতে চৈতন্যের স্থান নাই। সুতরাং "কনসাসনেস" বা চৈতন্যের কথা না বলাই ভাল। পূর্ব্বোক্ত সংস্কারগুলির আমরা পশু, উদ্ভিদ, জ্যোতিষ্ক প্রভৃতি এক একটা নাম দিয়া থাকি। তাহার পর সাধর্ম্ম্য, বৈধর্ম্ম্য বোধ কার্য্যটাও অনেকের মতে ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই হইয়া থাকে, কিন্তু সেটা ঠিক নহে। কারণ, গ্রহণ কার্য্যটাই ইন্দ্রিয় দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, তুলনা কার্য্য কি করিয়া হইবে?

এই স্মৃতি জীব-জীবনে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সংস্কারসমূহ অলক্ষিতভাবে কোথায় ও কি প্রকারে থাকে, তাহা বলা যায় না। বাহ্যতঃ দেখা যায় যে, এই স্মৃতি না হইলে জীবের, বিশেষতঃ মানুষের এক দণ্ড চলে না। চলে না বলিয়া যে একটা শক্তি বা বৃত্তি আপনি আসিয়া পড়ে, তাহার কোনও কারণ নাই। ইহার মূলে উদ্দেশ্য আছে বলিলেও একশ্রেণীর তার্কিক উদ্দেশ্যের[৩] কথা শুনিলে কুসংস্কার বলিবে। যাহা হউক, স্মৃতি আছে বলিয়াই

১। "ধর্ম্মসংগনি" নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে "চিত্তুপ্পাদকণ্ডম্" শব্দ প্রথম অধ্যায়ে ব্যবহৃত হইয়াছে। সংস্কৃতে উহা "চিত্ত-উৎপাদ" এবং ঐ পুস্তকে চিত্ত বা জ্ঞানের উৎপত্তি কি ভাবে হয়, তাহাই দেখান উদ্দেশ্য। উহারই অনুকরণে উৎপাদ শব্দ ব্যবহৃত হইল।

২। Organic sensation. ৩ Teleology.

মানুষ ভাবিতে পারে এবং ভাবিতে বা চিন্তা করিতে পারে বলিয়া জীব-জগতে মানুষই উন্নত। কোন বিষয় ভাবিতে হইলে আমাদের একটা লক্ষ্য থাকে এবং উহার অনুকূল বিষয়গুলি আমরা স্মরণ করি ও উহার মধ্যে যেগুলি আবশ্যক, তাহারই প্রতি মনঃসংযোগ করি এবং অপরাপর বিষয়গুলি আপনা আপনি মানস কেন্দ্র হইতে তিরোহিত হয়। তাহার পর বিতর্ক ও বিচার করি অর্থাৎ দ্রব্য সম্বন্ধে যে গুণ ও ক্রিয়া জানা আছে, উদ্দেশ্য সাধনে তাহার উপযোগিতার বিষয় আলোচনা করি। এ স্থলে যদি দুইটি লক্ষ্যের বিষয় থাকে, তাহা হইলে উভয় পক্ষের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য লইয়া তুলনা করি এবং অবশেষে একটা সিদ্ধান্ত করি অথবা করিতে পারি না।

পূর্ব্বকথিত সমস্ত প্রক্রিয়াগুলিই আভ্যন্তরীণ। বস্তুসমূহের ইন্দ্রিয়গৃহীত গুণ ও ক্রিয়া-সকল মানসপটে যে ভাবে অঙ্কিত হইয়া থাকে, তাহা লইয়াই গোলাপাড়া। তবে সংবেদন প্রকৃতপ্রস্তাবে দৈহিক ক্রিয়া, তাহার পর যে সকল স্নায়ু দিয়া ইন্দ্রিয়গৃহীত উত্তেজনা সংস্কারে পরিণত হয়, তাহা মানসিক। এখন দেখিতে হইবে, এই মানসক্রিয়া বিশেষভাবে মানুষেরই হইয়া থাকে এবং উহা যে আধারে বা যাহা অবলম্বনে হয়, তাহাই অহংব্যাপার। যাহা মানস ব্যাপার, তাহা তাহার নিজের এবং আভ্যন্তরীণ এবং যাহা মনকে সজাগ করিতেছে, তাহা তাহার নিজস্ব নহে—বাহিরের বস্তু। তবে কতকগুলি বিষয় যদিও শুদ্ধ আধ্যাত্মিক, কিন্তু তাহাদের অনুভূতি বাহ্য পদার্থের ন্যায় হইয়া থাকে যেমন সুখ ও দুঃখ, ভাব ও রস (ইমোশন্)। মানস আকৃতি[১] সংস্কার, বিচার প্রভৃতি সমস্তই মনোবিজ্ঞানের অন্তর্গত এবং নামযোজিত সংস্কার ও সিদ্ধান্ত তর্কশাস্ত্রের বিষয়। এই উভয় অর্থাৎ মনস্তত্ত্ব ও তর্কশাস্ত্র মিলিয়া জ্ঞানের ও সত্যের পরিচয় আমাদিগকে দিয়া থাকে।

মনের প্রক্রিয়া লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে কোনও গোল নাই। তবে মনের প্রকৃত অবস্থা বা উহার নিজের রূপ লইয়া মতদ্বৈধ আছে এবং তাহারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় এ স্থলে দিতে চেষ্টা করিব। কোন কোন পণ্ডিতের মতে মনটা শাদা কাগজের মত। শিশু এই শাদা কাগজ লইয়াই জন্ম গ্রহণ করে এবং এক একটি প্রাকৃতিক উত্তেজনার সহিত তাহার ইন্দ্রিয় ক্রিয়াশীল হইয়া নূতন নূতন জ্ঞান উৎপন্ন করে। তাঁহারা আরও বিশ্বাস করেন যে, ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানসমূহ অনুবন্ধ নিয়মে (এসোসিয়েশন্) সজ্জিত হইয়া চিন্তাধারা উৎপন্ন করে। যখন যেটুকু আবশ্যক, তাহা এই নিয়মবশেই জ্ঞানকেন্দ্রে উপস্থিত হয়। বাহ্যিক জগতে যেমন মাধ্যাকর্ষণ, অন্তর্জগতে সেইরূপ অনুবন্ধ নিয়ম। এই জন্য তাঁহাদের মতকে মানসরসায়ন মত বলে অর্থাৎ বাহ্য জগতে যেমন পরমাণুপুঞ্জ দ্ব্যণুক আকার ও পরে দ্রব্যে পরিণত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়জনিত খণ্ড জ্ঞান, রূপ, গন্ধ, জাতি প্রভৃতি লইয়া সংস্কার ও পরে চিন্তা কালে যথাযথভাবে স্বস্থানে উপস্থিত হয়। এ মতের আজকাল বড় আদর

১। Images.

নাই এবং ইহা লক্, হাব্‌টলী, মিলদ্বয় ও বেনকর্ত্তৃক পোষিত হইয়াছে। তবে মিল ও বেন উহার নূতন আকার দিয়াছেন। ইহাঁদের অপর নাম "এমপিরিসিসট।"

পূর্ব্বোক্ত মতের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতপ্রধান ক্যাণ্ট। অনুবন্ধবাদীরা দ্রব্যকেই বড় করিয়াছেন এবং মন তাঁহাদের চক্ষে একটি যন্ত্রমাত্র। এই বস্তুসমূহ মননামক যন্ত্রে ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া পতিত হইয়া নিজে নিজে আপন আপন স্থান খুজিয়া লয় এবং মনটা একটা নিষ্ক্রিয় আধারমাত্র। ক্যাণ্ট মনকে প্রাধান্য দিয়া, উহাতেই কতকগুলি জ্ঞানের ব্যাপার আরোপিত করিয়াছেন। গুণ, সংখ্যা, সম্বন্ধ এবং সম্ভাবনা প্রভৃতি বোধ ও কাল এবং কতকপরিমাণে দেশেরও বোধ মন বা বুদ্ধির স্বকীয় সম্পৎ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু-সমূহ মনের ঐ শক্তি দ্বারা সুরঞ্জিত হইয়া মানবজ্ঞানে পরিণত হয়। অনুবন্ধমতে দ্রব্যই সর্ব্বস্ব, ক্যাণ্টের মতে দ্রব্যগুলি সামগ্রীমাত্র, জ্ঞানাকারে পরিণত হইতে হইলে মনের সাহায্য ভিন্ন হয় না। যেমন গৃহনির্ম্মাণে ইষ্টক, কাষ্ঠ, লৌহ প্রভৃতি উপকরণমাত্র, সেইরূপ বাহ্য জগৎ উপকরণমাত্র, উহাদের সংস্থান ও সন্নিবেশ মনের দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। মন যতক্ষণ সংখ্যা, পরিমাণ, সম্বন্ধ প্রভৃতি তাহার স্বকীয় বৃত্তিগুলি বস্তুর উপর আরোপিত না করে, ততক্ষণ উহাকে জ্ঞান বলা যায় না, উহা নির্ব্বিকল্পক একটা কিছু প্রতীতিমাত্র। তবে মনঃসৃষ্ট জ্ঞানও ব্যবহারিক জ্ঞানমাত্র, স্বরূপজ্ঞান[১] ইহার পশ্চাতে আছে, তাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে বলিয়া আমাদের বোধগম্যও নহে। প্রজ্ঞা (রিসন্) মনের সর্ব্বপ্রধান শক্তি এবং উহার সাহায্যে আমাদের ধর্ম্ম ও নীতি-বোধ হইয়া থাকে এবং উহা দ্বারাই আমরা স্বরূপ-লোকের বা পরমার্থতত্ত্বের আভাস পাইয়া থাকি।

স্পেন্সারও ক্যাণ্টের মতই দর্শনতত্ত্বে অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি নব্য বিজ্ঞানের সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে, আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতিজ্ঞান সামগ্রী হইতে পারে, তবে উহা জ্ঞান নহে। জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে বস্তুসৃষ্ট নহে, উহার মূল আকার মনঃসৃষ্ট এবং ক্যাণ্টও তাহাই দেখাইয়াছেন। এই মূল আকার বংশপরম্পরালব্ধ শক্তিবিশেষ। সাদৃশ্যবুদ্ধি বা সমতাবুদ্ধি আমাদের জ্ঞানের একটি মূল আকার। বস্তুদ্বয়ের সমানতাবুদ্ধি মনোনিহিত নৈপুণ্যবিশেষ, তাহারই ফলে আমরা সমান অসমান বুঝি। জ্যামিতির প্রথম স্বতঃসিদ্ধও জ্ঞানমুখী, উহা বস্তুমুখী নহে। এইরূপ ভাবের জ্ঞানকে স্বতোবুদ্ধি বলা যায়।

আজকাল আরও কএকটা মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারি কথা বলা আবশ্যক। যাঁহাদের জড়ত্বে ও জড়বাদে অধিক অনুরাগ, তাঁহারা সকল বিষয়েই জড়কে প্রবল করিতে চাহেন। সেই সম্প্রদায় সাইকোলজিকে আর প্রাচীন আকারে দেখিতে চাহেন না। সম্বিৎ, সংবেদন, উপলব্ধি প্রভৃতি তাঁহাদের মতে বিজ্ঞানে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। উহাদের সম্বন্ধে আলোচনা অসার কল্পনামাত্র। আমরা কেবল জানি, উত্তেজনাও

১ Noumenon.

তাহার ক্রিয়া[১]। অর্থাৎ জড়ের উত্তেজনা ও তাহার ফল যাহা কিছু। প্রকৃতির আলোক প্রভৃতি সামগ্রী স্নায়ুপ্রান্তে ইন্দ্রিয়সমূহকে অভিহত করে ও তাহার ফলে যে একটা ক্রিয়া হয়, সেইটিই আমাদের বোধগম্য। কাজেই জীবশরীর, অতএব মানুষের শরীরও এক একটি যন্ত্রস্বরূপ ও উহা বাহ্য প্রকৃতির সংস্পর্শে আসিয়া যখন যেরূপভাবে প্রবর্ত্তিত হয়, তখন তাহাই করে। তাহার সম্বিৎ, তাহার চিন্তা, তাহার ইচ্ছা, তাহার সুখ, তাহার ক্রোধ, তাহার রস (ইমোশন্), এ সকলই প্রকৃতির ক্রিয়া এবং প্রকৃতির যাদৃচ্ছিক ক্রিয়ার দ্বারা মানুষের ক্রিয়া ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

ইহাদের মধ্যে প্রথম প্রত্যাবৃত্তক্রিয়াবাদ[২]। এই মত অনুসারে সম্বিৎ, অহং প্রভৃতি কিছুই নাই। এমন কি, জীবের স্বতোবুদ্ধি বলিয়া কোনও শক্তি নাই। দ্বিখণ্ডিত ব্যাংএর পায়ে সূচি বিদ্ধ করিলে সে মস্তক না থাকাতেও তাহার পা টানিয়া লয় অথবা ছিন্নমুণ্ড কুকুরের পায়েও ঐরূপভাবের উত্তেজনা দিলে সে তাহার পাদ চালনা করে। ইহাদের মুণ্ডহীন অবস্থাতে এরূপ ভাব কি করিয়া হয়? প্রথমতঃ ইহাদের স্পর্শস্নায়ু-প্রান্ত উত্তেজনার সংবাদ স্নায়ুকেন্দ্রে লইয়া যায় এবং তথা হইতে স্নায়ু শক্তি-স্রোত প্রবাহিত হইয়া, পায়ের পেশীদেশ-সংলগ্ন চালক স্নায়ুতে (মোটর নার্ভ) পৌঁছায় ও সেই ইঙ্গিত অনুসারে পায়ের পেশী চালিত হয়। বলা বাহুল্য, আমরা কেবল দুইটা ক্রিয়া মাত্র দেখি। প্রথমতঃ পায়ের নীচে উত্তেজনা ও পাদসঙ্কোচ। উহার পর পর কি ক্রিয়া হয়, তাহা সম্পূর্ণভাবে আনুমানিক। তাহা ছাড়া মনের একটা স্বতন্ত্র অধিকার আছে, যেহেতু উহার ইচ্ছা অনুসারে যে কোনও অঙ্গ চালনা করিতে পারে। কাজেই যন্ত্রবাদটা সকল মানসিক তত্ত্বের ও অবস্থার তৃপ্তিজনক ও রুচিকর ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

আরও একটা নূতন যন্ত্রবাদ হইয়াছে, তাহাকে ট্রোপিজম্[৩] বলে। এই বাদটির বয়স অধিক নহে এবং লোএব্ প্রমুখ শারীর তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ইহার উপর খুব ঝোঁক দিয়াছেন। উদ্ভিদ-সমূহ সূর্য্যরশ্মির প্রভাবে রশ্মির দিকে অগ্রসর হয় এবং শিকড়সমস্ত রস ও পুষ্টিলাভের জন্য নিম্নে গমন করে, ইহা অনেক দিন হইতে জানা আছে। কিন্তু ইহা কেন হয়, সে বিষয়ে লোকের ততটা দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। ইহাদের এই দুইটি গতি লইয়া ট্রোপি নামটির সৃষ্টি; কারণ, উহার মৌলিক অর্থ "ফেরা"[৪]। টর্ণ অর্থাৎ কোনও কারণে ইহারা সাধারণ দিক্ ছাড়িয়া অন্য দিকে ফিরে। সম্প্রতি এই সম্বন্ধে অনেক ক্ষুদ্র প্রাণী লইয়া পরীক্ষা করা হইতেছে। পক্ষবিশিষ্ট কীটকে কাচের বাক্সের মধ্যস্থ জলে ছাড়িয়া দিয়া, যদি একটা আলোকরশ্মি তাহাদের মুখের উপর বা একটি চোখের উপর পাতিত করা হয়, তাহা হইলে সেই আলোকরশ্মির প্রভাবে

১। Stimulus and Response.

২। Reflex action.

৩। Tropism from Gr. Trepein to turn.

৪। Behaviourism.

তাহাদের চোখের দিকের স্নায়ু উত্তেজিত হয় এবং সেই জন্য তাহাদের সেই দিকের পাখাও সঙ্গে সঙ্গে নড়িতে থাকে এবং যতক্ষণ রশ্মি ক্রিয়াশীল থাকে, ততক্ষণ তাহাদের এক পাখা নড়ার জন্য ঘুরপাক খাইতে হইবে। পতঙ্গসমূহ যে আলোকরশ্মির কাছে ঘুরিতে থাকে, তাহা পূর্ব্বোক্ত কারণেই হয়, যদিও সাধারণ বিশ্বাস যে, আলোকে প্রফুল্ল হইয়া কীটসমূহ আলোকের সহিত খেলা করে। এই জন্য লোএব্ সাহেব বলেন যে, তাবৎ জীবের ব্যবহার ও আচরণ প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারা নিষ্পন্ন হয়। সম্বিৎ, ইচ্ছা, প্রণয়, ভালবাসা, ও সকল কিছুই নয়—উলঙ্গ প্রকৃতির তাড়না মাত্র। যাহা হউক, এই মত অল্পে অল্পে মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্র আক্রমণ করিতেছে।

আরও একটা নূতন মার্কিন মত প্রচলিত হইয়াছে এবং এই অল্প দিনের মধ্যেই উক্ত মতে সম্প্রদায়বিরোধও উপস্থিত হইয়াছে। এই মতটির নাম আচারবাদ বলা যাইতে পারে। উক্ত মতাবলম্বী পণ্ডিতেরাও একপ্রকার যন্ত্রবাদী বটেন। প্রাচীন মনোবিজ্ঞানে তাঁহাদেরও শ্রদ্ধা নাই, আবার তাঁহারা একবারে স্নায়ুসক্সস্ববাদীও নহেন। তাঁহারা মনোবস্তু, সম্বিৎবস্তু প্রভৃতি অসার কল্পনা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন অথচ স্নায়ুই যে জ্ঞানের মূল অথবা মস্তিষ্ক, স্মৃতি ও জ্ঞানকে একই বস্তু বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মানব আচরণ মানবের বাহিক ও মানসিক কর্ম্ম। ম্যাকডুগাল মানবের জ্ঞান[১]সমষ্টি আছে, তাহা অস্বীকার করেন না এবং তিনি পূর্ণভাবে যন্ত্রবাদীও নহেন। তিনি বলেন যে জীবের আচরণে বা কর্ম্মে লক্ষ্য আছে, উদ্দেশ্য আছে, জীব, বাত্যাতাড়িত কাগজের গোলকের মত নহে। ওয়াট্‌সন্ সাহেবও এই মতের একজন অধিনায়ক। জ্ঞানসমষ্টি আছে, কি নাই, তাহা বিচার করিবার তাঁহার মতে আবশ্যক নাই। আচরণই আমাদের বোধগম্য এবং আচরণই মনস্তত্ত্বের আলোচনার বিষয়। ম্যাকডুগাল বলেন, কীট হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ড ও স্তন্যপায়ী জীব অবধি প্রত্যেকেরই স্বতোবুদ্ধি আছে। কাজেই মানবেরও স্বতোবুদ্ধি ও স্বতঃপ্রবৃত্তি আছে। জীবমাত্রেই এক মহাপ্রাণের[২] বশে কোনও অলক্ষিত অজ্ঞাত পথে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়াছে। ওয়াট্‌সন্ ও হোল্ট, ইহাঁরা উভয়েই মানুষের ক্রিয়া বা আচরণ প্রত্যাবৃত্তক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত মনে করেন। পণ্ডিত ম্যাকডুগাল বলেন, ইতর জীবের ন্যায় মানুষেরও কতকগুলি স্বতোবুদ্ধি বা মূল সংস্কার আছে—সন্তানরক্ষা বুদ্ধি, সংগ্রামবুদ্ধি, কৌতুহলবুদ্ধি, খাদ্যসংগ্রহবুদ্ধি, যৌথবুদ্ধি ইত্যাদি। এই সকল বুদ্ধির বা সংস্কারের প্রেরণায় মানুষের ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। একদিকে স্বতোবুদ্ধি ও অপর দিকে ভালবাসা, দ্বেষ, স্বদেশপ্রেমিকতা ইত্যাদি। এইগুলিও মানুষের মনে সতত স্বতঃ বর্ত্তমান। তাহাদিগকে ভাব (সেন্‌টিমেণ্ট) বলা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া রসও আছে অর্থাৎ ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি আছে। এই রসগুলি স্বতোবুদ্ধির সহিত জড়িত এবং উহারই সঙ্গে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহা হইতে আমরা মানবজ্ঞানের একটা

১। Experience.
২। Libido (Jung), Elan vital (Bergson).

দিক্ পাইতেছি অর্থাৎ বুদ্ধির দিক্‌টা। কিন্তু কতকগুলি বিশ্বাসও মানুষের আছে, অতএব মনঃ-প্রকোষ্ঠ দুইটি স্তম্ভের উপর খাড়া হইয়া আছে—একটি বুদ্ধিমুখী ও অপরটি বিশ্বাসমুখী। বুদ্ধিদ্বারা জ্ঞান বিজ্ঞান এবং বিশ্বাসের দ্বারা ধর্ম্ম, নীতি ও বিজ্ঞান প্রভৃতির মূল তথ্য বা বাদ।

ইহাকে মনস্তত্ত্বের নবতন্ত্র বলিতে পারা যায়। প্রাচীন আত্মাবাদ, অনুবন্ধবাদ, স্বতো গ্রহণবাদের সহিত এই মতের বিরোধ। আবার শুদ্ধ স্নায়ু বা মস্তিষ্কজন্য জ্ঞানবাদও এই নব্যতন্ত্রের প্রীতিকর নহে, কাজেই এই নূতনতর তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। এখন জ্ঞান সম্বন্ধে অপরাপর সমস্যাও আছে, সেই বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যক।

জ্ঞান উভয়বাহিনী অর্থাৎ একদিকে ইন্দ্রিয়গৃহীত প্রাকৃতিক পদার্থ ও তাহার পর উহার একটা সংস্কার এবং এই দুইয়ের সমন্বয় জ্ঞানে। এই সংস্কার ও প্রাকৃতিক পদার্থের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য বা কোন্‌টি প্রামাণিক? এইখানে একটা সমস্যা। বার্কলী বলেন, পদার্থ বা দ্রব্যের বার্ত্তা আমরা জানি না; তবে আমরা জানি, আমাদের উপলব্ধি বা সংস্কার, ইহা এক প্রকার বিজ্ঞানবাদ। স্বরূপতঃ বস্তুর রূপ বা কোমলতা কঠিনতা আছে কি না, তাহা আমাদের জানার কোনও সম্ভাবনা নাই, তবে আমরা উহার সংস্কার মাত্র জানি[১]। বস্তু আমরা যথার্থ ভাবে জানি, ইহা লোকায়ত মত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে মনোগৃহীত সমাচার ভিন্ন বস্তুর আর কোনও নিদর্শন নাই। ষ্টুয়ার্ট মিল এই মত গ্রহণ করিয়াছেন, তবে তিনি ইহা স্বতন্ত্রভাবে দেখিয়াছেন।

মন ও বস্তু দুইটি বিভিন্ন সামগ্রী অথচ ইহাদের সম্মিলন ও সামঞ্জস্য কি করিয়া হয়, এই প্রশ্ন সকল পণ্ডিতকেই কোন না কোন ভাবে প্রক্ষুব্ধ করিয়াছে। ডেকার্টের মতে ঈশ্বরকর্ত্তৃক সময়ে সময়ে এই ঐক্য[২] সম্পন্ন হইয়া থাকে। লাইবনীট্‌জ বলেন, এই ঐক্য[৩] পূর্ব্বব্যবস্থিত। স্পেন্সার্ বলেন, বস্তুর যথাযথ জ্ঞান আমাদের হয় না। তবে উহার যে ভাণ হয়, তাহা রূপান্তরিত সত্তা[৪]। আমাদের দেশে যোগাচার ও সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় বাহ্যার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান এবং যোগাচারীরা বাহ্যার্থের অস্তিত্ব অস্বীকারই করেন। তবে সৌত্রান্তিকেরা বাহ্যার্থ অনুমানের বিষয় বলিয়া থাকেন।

ষড়্‌দর্শনের সূত্রকারেরা জ্ঞানমূলে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। কাজেই তাঁহারা সকলেই "এম্‌পিরিসিষ্ট"। তবে ঐ সঙ্গে মীমাংসক ভিন্ন সকলেই যোগজ জ্ঞান বা প্রাতিভ জ্ঞান মানিয়া লইয়াছেন। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের প্রথম অবস্থা নির্বিকল্পক অর্থাৎ তাহাতে জাতি, দেশ, কাল প্রভৃতি কোন উপাধি বা বিশেষণ থাকে না, উহা কেবল জ্ঞানমাত্র। পরে

১। Esse is percipi.
২। Occasionalism.
৩। Pre-established harmony.
৪। Transfigured realism.

জাতি প্রভৃতির সহিত উহা সবিকল্পক জ্ঞানে পরিণত হয় এবং তৎপরে "আমি ইহা জানিতেছি" এইরূপ জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানের নাম অনুব্যবসায়।

বাহ্যার্থ বিষয়ে যেমন এক সম্প্রদায় অনিশ্চয়তা স্থির করিয়াছেন, তেমনি ইহার বিরোধী সম্প্রদায় বস্তুর সম্ভাব[1] জোরের সহিত ধরিয়া লইয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহাঁদের সংখ্যাই অধিক। আমাদের দেশের প্রাচীন দার্শনিকেরা প্রায় সকলেই বাহ্যসত্তাবাদী, কেবল বৈদান্তিকেরা বাহ্য পদার্থ ব্যবহারিক ভাবে সৎ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত, তাঁহারা জ্ঞানমাত্রেই আপেক্ষিক[2] বা পরিচ্ছিন্ন, এইরূপ মনে করেন। তাঁহাদের মতে বস্তুর স্বরূপ আমাদের পক্ষে অজ্ঞেয়। বস্তুর চিহ্নমাত্র আমরা জানি, তাহাদের যথার্থ প্রকৃতি আমাদের জানিবার উপায় নাই। জগতের পশ্চাতে নিরুপাধিক, পূর্ণ পদার্থ আছেন আর তাহা ছাড়া যাহা কিছু, তাহা সোপাধিক, পরিচ্ছিন্ন বা আপেক্ষিক। ইহার মধ্যে হেগেল, ব্রাডলী ও রয়স্ এই পূর্ণ পদার্থকে একভাবে দেখিয়াছেন, আবার হ্যামিল্টন্ ও স্পেন্সার ইহা অন্যভাবে দেখিয়াছেন। বৈদান্তিক মতও ইহার সহিত উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এ স্থলে আর একটি বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক। আমাদের জাতি বা ব্যক্তিজ্ঞান কি ভাবে হইয়া থাকে? পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে এক দল[3] আছেন, তাঁহারা জাতি-জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় স্বীকার করেন এবং তাঁহারা বলেন যে, আমাদের গরু বা কুকুর প্রভৃতি এক একটা জাতিবাচক জীব বা উদ্ভিদের জ্ঞান আছে। অপর দল[4] বলেন যে, নাম বা শব্দই জাতি বুঝাইয়া থাকে, উহার প্রকৃত সত্তা নাই।

যাহা হউক, অতি সংক্ষেপে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জ্ঞান সম্বন্ধে মত এই স্থানে সন্নিবিষ্ট হইল। মন এবং বস্তু, এই উভয়ই সমস্যাপূর্ণ। জড়বাদ, যন্ত্রবাদ, ইন্দ্রিয়বাদ, চিদ্‌বাদ প্রভৃতি বিভিন্ন চিত্তে প্রতিফলিত হইয়া জ্ঞানবাদ তত্তৎক্ষেত্র অনুসারে স্ফুরিত হইয়াছে। হয় ত প্রত্যেকেই আপন আপন রূপে কিছু সত্য বহন করিতেছে, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব গুহাতেই নিহিত আছে। যাঁহারা চিত্তকে একবারে জড়ধর্ম্মী বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা কি করিয়া জড় বস্তু, চিত্তরূপ জড়ের সহিত মিলিত হইয়া জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহার কোনও কারণ দেখাইতে পারেন না। গতিশীল গোলক স্থির গোলককে অভিঘাত করিলে শেষোক্ত গোলকও গতিশীল হইয়া থাকে, ইহা সত্য; কিন্তু উভয়ের মধ্যে কেহই জানে না, তাহারা কি করিতেছে; ইহাও বুঝিবার বিষয়। জীবচিত্ত সম্বন্ধে জড়বাদ ঠিক খাটে না, যেহেতু উহার অভি-ঘাতের পর আর একটা পরিণাম হয়, তাহাই জ্ঞান। এই স্থলে একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য বলিয়া

১। Realist.

২। Relativity.

৩। ইহাদের নামও Realist.

৪। Nominalist.

তাহা তুলিয়া দিতেছি। কোন একজন খ্যাতনামা কেম্‌ব্রিজ জ্যোতিষাচার্য্য "নব রিলেটিভিটি" সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—"এই নূতন নিয়ম পদার্থতত্ত্বের নিয়মসমূহকে একত্র বাঁধিয়া রাখিয়াছে ও সূক্ষ্ম গণনার পক্ষে সুবিধা করিয়া দিয়াছে। কিন্তু বস্তুর গূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে এই জ্ঞান শাঁস ও শামুকের খোলার ন্যায় অসার। যে অজ্ঞাত সামগ্রী ভৌতিক জগতের অন্তরে অন্তরে রহিয়াছে, তাহাই আমাদের জ্ঞানবস্তু এবং উহা পদার্থতত্ত্বের প্রণালীতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যেখানে বিজ্ঞান খুব অগ্রসর হইয়াছে, সেখানে মন প্রকৃতিকে যত-টুকু আত্মদান করিয়াছে, ততটুকুই সে প্রকৃতির নিকট হইতে পাইয়াছে। অজ্ঞাত সলিল-তীরে পদচিহ্ন দেখিয়া তাহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বাদের পর বাদ রচনা করিয়াছি এবং পরে পদাঙ্ক হইতে জীবের আকৃতিও পুনর্গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছি। কিন্তু হায়! সে আকৃতি আমাদেরই।"[১] বাস্তবিকই মানুষের বাদ অনুবাদের সংখ্যা নাই। কিন্তু জড়ই বল, আর মনই বল, তাহাদের স্বরূপ বা তাহাদের মূল আকার সম্বন্ধে আমরা কি জানিয়াছি? বুদ্ধি ও উন্নমপ্রাপ্ত মানুষ নিজের যতটুকু অধিকার, নিজের যেরূপ প্রবৃত্তি ও মানসিক ভাব, তাহাই তিনি মনুষ্যসমাজকে দিয়াছেন।

এই অবকাশে জ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। দুর্ভাগ্যবশতঃ জ্ঞান শব্দটি আমাদের অতি সঙ্কীর্ণভাবে ব্যবহার করিতে হয়। ইংরাজী 'কগ্‌নিশন্", "এক্সপিরিয়েন্স", "কন্‌সেপ্‌-শন্", 'নলেজ্", 'সেন্‌সেশন", 'কনশসনেস" প্রভৃতি বোধের বিভিন্ন সংস্থানের বিভিন্ন নাম না থাকায় আমাদের জ্ঞান শব্দই ব্যবহার করিতেছে। যাহা হউক, যত দিন বাঙ্গালা সাহিত্যে দর্শনের দেহ পরিপুষ্ট না হয়, তত দিন আমাদের এক অঙ্গ দিয়া অপর অঙ্গের অভাব পূরণ করিতে হইবে। পণ্ডিতেরা জ্ঞানের অনেক প্রকার ভাগ করিয়াছেন। (১) (ক) সাক্ষাৎজ্ঞান, (খ)অসাক্ষাৎজ্ঞান। সাক্ষাৎজ্ঞান—যাহা ইন্দ্রিয়গোচর হয় এবং অসাক্ষাৎ জ্ঞান, যাহা তাহা হয় না। (২) একবিষয় জ্ঞান, যেমন গো, বৃক্ষ ইত্যাদি এবং অনেকবিষয়াশ্রিত জ্ঞান, যেমন বৃক্ষ প্রভৃতির উৎপত্তি, পরিপুষ্টি, আকৃতি প্রকৃতির জ্ঞান। এই জ্ঞানদ্বয়কে এক হিসাবে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জ্ঞানও বলা যায়। (৩) পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান (মিডিয়েট্ ও ইমিডিয়েট্ নলেজ্)। যাহা নিজের ইন্দ্রিয়গোচর হয় নাই, তাহা পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ জ্ঞানের মধ্যে যোগজ জ্ঞানও ধরা যাইতে পারে। কেহ কেহ (আরিস্ততল ও ক্যাণ্ট) জ্ঞানকে (ফরম্যাল ও মেটিরিয়াল) তাত্ত্বিক ও বাস্তব, এই দুই ভাগ করিয়াছেন। জ্ঞান একদিকে প্রত্যক্ষ অনুভূতি (এপ্রিহেন্‌শন্) এবং আর এক দিকে অববোধ বা বুঝা (কম্‌প্রিহেন্‌শন্)। অন্ধের আলোকজ্ঞান অববোধ মাত্র।

---

(১) A. S. Eddington—Space, Time and Gravitation
(ক) Knowledge by acquaintance.
(খ) Knowledge about

যাহা হউক, একৈক জ্ঞানে বা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে বিশেষ কোন গোল নাই। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে যে সংস্কার হয় এবং স্মৃতি সাহায্যে যাহার পুনরুদ্বোধ হয়, সেই সকল সংস্কারের আমরা এক একটা নাম দিয়া থাকি, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই সকল নাম আমরা বাক্যে প্রকাশ করিতে পারি এবং এই স্থলেই তর্কশাস্ত্রের উৎপত্তি। চিন্তা দ্বারা অনুমান সাহায্যে (গ) আমরা এক একটা সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি এবং এই সিদ্ধান্ত এক একটি উক্তি। ক্যান্টের মতে আন্বীক্ষিকী জ্ঞান দুই প্রকার—বিশিষ্টবৈশিষ্ট্য[১] জ্ঞান ও সংশ্লেষক[২] জ্ঞান। "বস্তুমাত্রেরই বিস্তৃতি আছে," ইহা বিশিষ্টবৈশিষ্ট্য অথবা বিশেষণজ্ঞান, যেহেতু বিস্তৃতি বস্তুর একটি সাধারণ গুণ। আবার "পৃথিবী একটি গ্রহ," এই উক্তিটি সংশ্লেষক জ্ঞানের পরিচয় এবং ইহাই তাঁহার মতে প্রকৃত জ্ঞান, যেহেতু ইহাতে একটা নূতন বিষয়ের প্রতীতি হইল।

তর্কশাস্ত্রের অবয়বে আজকাল পণ্ডিতদের ততটা শ্রদ্ধা নাই। তাঁহারা বলেন, উহাতে জ্ঞানের কোনও প্রসারতা দেখা যায় না। সকল মানুষই মরণশীল, অতএব হরিও মরিবে, এ ত জানা কথা। যাহা হউক, এই প্রাচীন "অবয়ব" একেবারে প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। তর্কশাস্ত্রের উদ্দেশ্য সম্যক্ বা অবিসম্বাদী জ্ঞানপ্রাপ্তি। ঐ জ্ঞান ভ্রমশূন্য হওয়া আবশ্যক এবং যাহা ভ্রমশূন্য, তাহাই প্রমাজ্ঞান ও তর্ক-শাস্ত্র ঐ বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করার উপায় দেখাইয়া দেয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সংস্কার অবধি মানসিক ক্রিয়া, কিন্তু সংস্কার ছাড়াও জ্ঞান বিষয়ে অপরাপর আবশ্যকীয় সামগ্রী আছে এবং তাহাও মানসিক। তাহা নিম্নে দেখাইতেছি। হিন্দু এবং পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা সংশয়মূলে জ্ঞান উৎপত্তি দেখিয়া থাকেন। পাশ্চাত্যদের ইহা "ফিলসফিক ডাউট"। ইহাকে কৌতূহল, জিজ্ঞাসা বা জানিবার ইচ্ছাও বলিতে পারা যায়। সংশয় হইলেই যে জানিতে পারা যায়, তাহা বলিতে পারা যায় না। কতক বিষয়ের জ্ঞান চিরকালই হয় ত সংশয় থাকিয়া যায়। মঙ্গল গ্রহে জীব আছে কি না, তাহা এখনও প্রমাণিত হইবার কোনও উপায় নাই। অথবা দেশ ও কাল সান্ত, কি অনন্ত, তাহাও জানিবার কোনও পন্থা নাই। উহা আমাদের পক্ষে এখনও অবিদ্যা বা অজ্ঞান।

অতএব জানিবার চেষ্টা থাকিলেই যে জানা যায়, তাহা ঠিক নহে। কাজেই জ্ঞানের ক্রম-(ডিগ্রী) বিভাগও হইতে পারে। কতক বিষয় নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানিতে পারা যায়, কতক বা সম্ভাবনা আকারে, আবার কতক পরের মুখে শুনিয়া বা গ্রন্থাদি পড়িয়া (শব্দজ্ঞান ইংরাজী অথরিটি) এবং অপর যাহা কিছু জানি, তাহা কেবলমাত্র বিশ্বাস আকারেই আছে। এই বিশ্বাসলব্ধ জ্ঞানই মানুষের অন্তঃকরণে অধিকতর স্থান পূর্ণ করিয়া থাকে, যেটুকু আমাদের নিজস্ব, যাহা সত্য ও অভ্রান্ত বলিয়া জানি, তাহার মধ্যেও আবার দুই প্রকার ভাগ হইতে পারে—কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী[৩] বা নিত্য বা অব্যভিচারী, আবার কতক কাদাচিৎক[৪]

গ। অনুমান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে প্রবন্ধবিস্তৃত হইয়া পড়িবে।

১। Analytical. ২। Synthetical.

৩। Necessary.

৪। Contingent.

অর্থাৎ কখনও কখনও হইয়া থাকে। যখন সংশয় একবারে চলিয়া যায়, তখনই সত্যের বা প্রজ্ঞা-জ্ঞানের উপলব্ধি হয়। সংশয় হয় ভ্রমের জন্য। কারণ, কোন মানুষই আপনাকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতে পাবে না। অতএব প্রমাত্ববাধক জ্ঞান হয় কি করিয়া? আবার কি করিয়া সত্যকে সত্য বলিয়া আলিঙ্গন করি? ইহার কি কোনও পরিমাপক আছে, কোনও জ্ঞাপক আছে? যদি থাকে, তাহা হইলে উহা মনেরই একটা বৃত্তি অথবা মনের অতীত অপর কোনও ব্যবস্থাপক শক্তি। ভ্রম সমস্ত দূরীভূত হইল কি না, তাহা ত জানিবার কোনও উপায় নাই। প্রাচীনেরা হয় ত পৃথিবীকে ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ অথবা বিস্তৃত বলিয়া মনে করিতেন। এখন আমরা ইহা ভ্রম-সঙ্কুল বলিয়া বিবেচনা করি। ইহা একটা তাঁহাদেব বিশ্বাস মাত্র ছিল, ইহাতে সংসারযাত্রায় কোনও ইষ্টানিষ্ট বা বিঘ্ন ছিল না। অতএব সত্যের অনুভূতি আধ্যাত্মিক। যিনি সত্যের আবিষ্কর্ত্তা, তিনি ঋষি বা বুদ্ধ এবং সাধারণ মানুষও স্বীয় ক্ষমতা অনুসারে সেই সত্যের আস্বাদন করিতে পারে।

মানুষের সংশয় ভ্রমেব জন্য। যদি সর্ব্বজ্ঞতা মানুষের থাকিত, তাহা হইলে কোন কথাই ছিল না। এই ভ্রমের প্রধান কারণ, আমাদের ইন্দ্রিয় ও স্মৃতি। প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকেরা ইহা জানিতেন। ইন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা জ্ঞানের প্রধান অন্তরায়, তাহা আমরা দৈনন্দিন জীবনে অনেক স্থলেই উপলব্ধি করিয়া থাকি। আব অনুস্মৃত বিষয়ও সকল সময়ে ঠিক সংবাদ দেয় না। এক মাস আগে অথবা ২৫ দিন আগে কোনও ঘটনা ঘটিয়াছে কি না, অথবা কোনও ব্যক্তিকে কলিকাতায় অথবা অপর কোনও স্থানে দেখিয়াছি, কিংবা তাহার সহিত কি বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা অনেক সময়ে স্মরণ করা যায় না। কাজেই মানুষের ইন্দ্রিয় ও স্মৃতি, উভয়ের উপরেই অবিশ্বাস। ভ্রমের কারণ সম্বন্ধে অনেক পুস্তকাদি বাহির হইয়াছে, আমাদের দেশের পণ্ডিতদেব মধ্যেও অসৎখ্যাতি, অন্যথাখ্যাতি প্রভৃতি কএকটি ভ্রমের আকার দেখিতে পাওয়া যায়। তবে ভ্রম ঐ দুই কারণেই হইয়া থাকে অর্থাৎ উহা ইন্দ্রিয়ের অথবা মনেব অপটুতাব জন্য উৎপন্ন হয়।

কিন্তু ভ্রম অন্য স্থলেও হইতে পারে। চিন্তাকালে বা তর্কস্থলে, সম্বন্ধের ব্যভিচারজন্য ভ্রান্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি কেহ বলে, পশু এবং মানুষ, উভয়ই প্রাণবিশিষ্ট, অতএব পশু চতুষ্পদ বলিয়া মানুষও চতুষ্পদ। এইরূপ সিদ্ধান্তে অনৈকান্তিক ভ্রম আছে এবং ইহা হেত্বা-ভাস। তর্কশাস্ত্রে জাতি বা ধর্ম্মী বিভাগের দোষে যে ভ্রম উৎপন্ন হয়, তাহা হেত্বাভাস। এই ভ্রম লইয়া মীমাংসকেব সহিত নৈয়ায়িকেব অনেক বাদবিতণ্ডা আছে, তাহা এ স্থলে দেখাইবার প্রয়োজন নাই।

মন অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, আমাদেব বার আনা রকম জ্ঞান শব্দজ প্রমাণ বা পরের মুখে শুনিয়া ও কতক অপ্রমাণিত বিশ্বাস, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শব্দজ প্রমাণ-গুলি সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিকের কথা বলিয়া উহা সত্য বলিয়া মানিয়া লই। বিশ্বাসগুলি অধিকাংশ স্থলেই ধর্ম্ম, নীতি ও আচার অনুষ্ঠান-বিষয়ক। যখন বিজ্ঞান খুব প্রকাশ

স্থায়ী ছিল, তখন বিশ্বাসসমূহ অমূলক বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু বিজ্ঞানেরও অনেক বাদ আছে;—যেমন স্নায়ুবাদ, অভিব্যক্তিবাদ, ঈথরবাদ; সেগুলিও অপ্রমাণিত বিশ্বাসমাত্র। হিন্দু দার্শনিকেরা প্রায় সকলেই যোগ দ্বারা অনিন্দ্রিয় বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান হয়, ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এই মূল তত্ত্ব-জ্ঞানের নাম বোধি।[১] কাজেই জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু দার্শনিকেরা সকলেই একবাক্যে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা স্বীকার করিয়াছেন। জৈন, বৌদ্ধ (মাধ্যমিক) ও বৈদান্তিকেরা জ্ঞানের দুই প্রকার ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। একটা লৌকিক ও অপরটি অলৌকিক। আজকাল পাশ্চাত্যদের মধ্যেও ইনটুইসনবাদের অল্পে অল্পে আবার আদর হইতেছে। লীবনিজ ও ক্যান্টের স্বতঃপ্রণোদিত জ্ঞানবাদ উড়াইয়া দিলে জ্ঞানের কোনও অর্থই থাকে না।

সত্যের পরীক্ষা কি করিয়া হয়? কি ভাবে সত্যের সত্যতা আমরা জানিতে পারি? হিন্দু দার্শনিকেরা আত্মাকে সত্যের প্রমাতা বা প্রমাণকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রায় সকল দেশেই পণ্ডিতেরা বস্তুর বা অস্তিত্বের সহিত মনের ঐক্যকে (ক) সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু আমরা কি বস্তুর সব গুণগুলি জানিতে পারি? হয় ত কতক জানি, কতক জানি না। সেই জন্য সত্যের এই ঐক্যবাদপ্রবচনে অনেকে সন্দিহান হইতেছেন। যেহেতু কবি ও বৈজ্ঞানিক বস্তুতে যাহা দেখে, তুমি আমি তাহা ত দেখিতে পাই না? সুতরাং ঐক্য হইল কই? কেহ বলেন, যাহার বিপরীত কল্পনা করা যায় না, তাহাই সত্য[২]; কিন্তু ইহাতেও পূর্ব্বোক্ত দোষ আসিয়া পড়ে। ইহা ছাড়া আরও বাদ আছে। ন্যায়মতে যাহা প্রবৃত্তি-জনন-সমর্থ, তাহাই সত্য। ঝিনুকের খোলা দেখিয়া যে রূপা মনে করে এবং তজ্জন্য লাভের বস্তু বোধ করিয়া উহা কুড়াইবার প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সে উহা সত্যই রজত মনে করিয়াছে। বৌদ্ধেরা বলেন, অর্থক্রিয়াকারিত্বই সত্যের পরীক্ষা। ইহাতে ও প্রবৃত্তিজননসমর্থবাদে বিশেষ প্রভেদ নাই।

আজকাল কোন কোন পণ্ডিত একটা নূতন মত তুলিয়াছেন—উহার নাম প্র্যাগম্যাটিসম্। উহা প্রোতাগোরাসের উক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি বলিয়াছেন,—"মানুষই সকল জিনিসের পরিমাণকর্ত্তা।" সত্যের জ্ঞান হইতে পারে না। কেহ কেহ অর্থক্রিয়াকারিত্ব ইহার প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করিতে চাহেন। কিন্তু উহা কতটা সমীচীন, তাহা বলিতে পারি না। পূর্ব্বে বিশ্বাসরূপ জ্ঞানের কথা বলিয়াছি। তাঁহারা বলেন, সত্য জ্ঞানটা লোকের মনের গঠন অনুসারে হইয়া থাকে। মানুষের বিশ্বাস, তাহার মত ও ভাব[৩] অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হয়। মনে

১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়-ব্যবহৃত।

ক। Correspondence, যথা ন্যায়মতে তদ্বতি তৎপ্রকারকং জ্ঞানম্।

২। Hamilton ও Herbert Spencer.

৩। Temperament.

করুন, যাঁহারা জড়বাদী, তাঁহাদের জীবের চেতনা একটা রাসায়নিক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়; আবার যাহারা প্রাণ একটা স্বতন্ত্র শক্তিবিশেষ বিবেচনা করেন, তাঁহারা প্রাণকে অতি-রসায়ন ব্যাপার বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। বিশ্বাসসমূহ কার্য্যকরী[১] হইলে অথবা উহাদ্বারা মানুষের বা সমাজের কোনরূপ অকল্যাণ না হইলে সে বিশ্বাসে কিছুই দোষের নাই। কতকগুলি বিশ্বাস লইয়া যদি সুবিধা হয়, উহাতে কোনও ক্ষতি নাই। বিজ্ঞানেও যে থিওরি আছে, তাহাও এই শ্রেণীর মধ্যে আসিয়া পড়ে। যখন লোকে বিশ্বাস করিত যে, পৃথিবীর চারি দিকে সূর্য্য ঘুরিতেছে, তখন তাহারা ঐ বিশ্বাস লইয়া চলায় কোনও ক্ষতি হয় নাই। প্র্যাগ্‌ম্যাটিস্‌মবাদ মনস্তত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র ও দর্শনের দিক্ হইতে গ্রন্থকারেরা বিচার করিয়াছেন। ইহাতে এইটুকু বুঝা যায় যে, সত্য লক্ষ্মীর ন্যায় চঞ্চলা। এক যুগে যাহা সত্য, পরের যুগে তাহা অসত্যে পরিণত হইলেও কোনও ক্ষতি নাই। তবে মানুষ বিশ্বাস করিতে ছাড়িবে না।

যাঁহারা ইন্দ্রিয়মূলে জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করিতে চাহেন অর্থাৎ "এম্‌পিরিসিষ্ট" বা "একস্‌-পিরিয়ন্ স্যালিসট," তাঁহাদের মত অসম্পূর্ণ ও যুক্তিশূন্য। যুগে যুগে বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, ধর্ম্ম ও নীতিতে মানবসমাজে নূতন নূতন জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। জ্ঞান একমুখী হইলে নূতনের অবকাশ থাকিত না। আদিম মনুষ্যসমাজ হইতে জ্ঞানের বহু পরিবর্ত্তন দেখা যায়। অতএব জ্ঞানের একটা আত্মনির্ব্বাচন ও স্বতঃপ্রকাশ আছে। যখন যাহা আবশ্যক, তখন তাহা আপনার ভাবে জ্ঞানরূপে আপনি প্রকাশিত হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ বস্তুর লিঙ্গমাত্র বুঝাইয়া দেয়। নূতন সংস্থান ইন্দ্রিয় দ্বারা হয় না। কেবল পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষায় কি হইবে? জ্ঞান যতক্ষণ আত্মদান না করিবে, যতক্ষণ মানবমনে উহা স্ফুলিঙ্গ আকারে আত্মপ্রকাশ না করিবে, ততক্ষণ শত বৈজ্ঞানিক উপায়েও কিছু ফল হইবে না। পাশ্চাত্যেরা এখন জ্ঞানের সেই রহস্যপূর্ণ দিক্‌টা উপলব্ধি করিতেছেন, তাই আজকাল "ইনটুইসন্"এর এত আদর। প্রাচ্য পণ্ডিতেরা "এম্‌পিরিসিষ্ট" হইলেও জ্ঞানের সে রহস্যটা বহু পূর্ব্বে বুঝিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহারা সেই "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" আস্বাদের জন্য জ্ঞানের একটা স্বতন্ত্র দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহারা বলেন যে, উহা বাদমাত্র নহে, উহা ধ্যানগম্য এবং ধ্যানরূপ চিন্তাধারায় উহা প্রকাশিত হয়। জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, সকলই ধ্যানসিদ্ধ একাগ্র চিন্তাপ্রণালীর দ্বারা করতলস্থ আমলকবৎ উহার আদান হইয়া থাকে।

শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য

১। Workable.

শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের লেখক রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীকর নন্দী (রায় বাহাদুর মহাশয়ের মতে শ্রীকরণ নন্দী) ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক দুইজন কবির মহাভারতের বিবরণ দিয়াছেন। * ১৩৩১ বঙ্গাব্দের প্রতিভা পত্রিকার চতুর্থ খণ্ডে মৌলভী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মহাশয় শ্রীকর নন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বরের অভিন্নত্ব বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লেখেন। বিগত ১৯২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী (Annual Report) নামক পত্রিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যক্ষ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার বিবরণীতে প্রকাশ করেন যে, শ্রীকর নন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বরের অভিন্নত্বপ্রতিপাদক প্রমাণ তাঁহাদের সংগৃহীত পুথিগুলিতে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া আমার ঐ সকল পুথি পড়িবার ইচ্ছা হয়। পুথি অনেকগুলি আছে। একখানি পরাগলী মহাভারতের পুথির লিপিকাল ১৬১০ শকাব্দ (=১৬৮৮-৮৯ খ্রীঃ)। এই পুথিখানি সম্পূর্ণ, অর্থাৎ ১৮টী পর্ব্বই ইহার মধ্যে আছে, তবে মধ্যে মধ্যে দুই একখানি পাতার অভাবও আছে, এবং কয়েকখানি পাতা অপাঠ্যও হইয়া পড়িয়াছে। আমি এই পুথিখানিতে (ঢা, বি, ২০২৫ সংখ্যক পুথি) দেখিলাম যে, পরাগলী মহাভারতের সর্ব্বত্রই শ্রীকর নন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বরের ভণিতা পাওয়া যায়। শহীদুল্লাহ সাহেব লিখিয়াছিলেন যে, অশ্বমেধ পর্ব্বে কেবলমাত্র শ্রীকর নন্দীর এবং অন্যান্য পর্ব্বে কেবলমাত্র কবীন্দ্র পরমেশ্বর বা কবীন্দ্রের ভণিতা পাওয়া যায়। পুথিগুলি পড়িয়া দেখা গেল, তাঁহার এ অনুমান অমূলক। সুতরাং শ্রীকর নন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর, দুই জন বিভিন্ন ব্যক্তি নহেন। পরাগলী মহাভারতের নানা পর্ব্বের পুষ্পিকা হইতে কয়েকটী ভণিতা উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) শ্রীযুত পরাগল খান মহামতি। দারিদ্রভঞ্জন বির ক্ষনাথের গতি॥
কুতুহলে পুছিলেন্ত ভারতকাহিনি। জেনমতে পাণ্ডবে হারাইল রাজধানী॥
বনবাসে আছিলেন্ত দ্বাদশ বৎসর। কোন কর্ম্ম করিলেক বনের ভিতর॥
বর্ষরেক কথা ছিল অজ্ঞাতবসতি। কেমত পৌরসকারে পাইল বসুমতি॥
এ সব রহস্যকথা সংখেপ করিয়া। পুরান ভারত কথা পাঞ্চালী রচিয়া॥
তাহান আদেশমালা মাথে আরোপীয়া। শ্রীকর নন্দীএ কহে পাঞ্চালী রচিয়া॥

—ঢা, বি, ২০২৫ সং পুথি, আদিপর্ব্ব, ২৩ পৃষ্ঠা।

---

* ব. ভা. ও সা. (৫র্থ সং) ১৪২—১৫২ পৃঃ।

(২) বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃতলহরি। স্তুনিলে অধর্ম্ম হবে৷পরলোকে তরি ॥
ভারতের পুন্যকথা পুন্যবন্তে সুনে। পুত্রে পৌত্রে ধনে ধান্যে বাচএ কল্যানে ॥
লস্কর পরাগল মহিমা অপার। কবিন্দ্রে কহিল কথা রচিয়া পয়ার ॥
—ঐ, উদ্যোগপর্ব্ব, ৯৯ খ পৃষ্ঠা।

(৩) বজয় পাণ্ডবকথা অমৃতলহরী। সুনিলে অধর্ম্ম হবে পরলো[কে]ক তরি ॥
লস্কর পরাগল গুণের নিধান। অষ্টাদস ভারতেত জার অবধান ॥
—ঐ, ভীষ্মপর্ব্ব, ১১৯ খ পৃষ্ঠা।

(৪) ইহলোকে সুখভোগ পরকালে স্বর্গলোক, ভারতের পুন্যকথা সুনি।
শ্রীযুত নায়কবর, লস্কর পরাগল, কবিন্দ্রেত পুছে পুনি পুনি ॥
বিজয় পাণ্ডব নাম, পুন্যকথা অনুপাম, অমৃত সিঞ্চিল কলেবর।
শ্রবন কলসে ভরি, মহাজনে পান করি, কভো না জাইব জমঘর ॥
—ঐ, কর্ণপর্ব্ব, ২০২ ক পৃষ্ঠা।

(৫) লস্কর পরাগল ধর্ম্ম অবতার। কবিন্দ্র পরমেশ্বরে রচিল পয়ার ॥
শ্রীযুত নায়ক লস্কর পরাগল। বিজয় পাণ্ডব সুনি মনে কুতুহল ॥
বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃতলহরি। সুনিলে অধর্ম্ম হবে পরলো[কে]ক তরি ॥
ইতি শ্রীমহাভারতে পাণ্ডববিজয়ে পরিক্ষিতজন্মঃ সমাপ্তঃ। শ্রীরস্তু সর্ব্ব যগতাং
শ্রীরস্তু লেখকে ময়ি শ্রীরস্তু লিখিতং যস্য তস্য কৃষ্ণপ্রসাদতঃ ॥ শুভমস্তু শকাব্দাঃ
১৬১০ পং সন ৪৮৬ তেরিখ ২৬ পৌষ মার্গসির্ষে। শ্রীকুমুদ পণ্ডিতস্য স্বাক্ষরমিদং ॥
—ঐ, অশ্বমেধ পর্ব্ব, ২৪০ পৃষ্ঠা।

(৬) অশ্বমেধ পুণ্যকথা কল্পতরু ধর্ম্মলতা, পাতক তাপের নাই ভয়।
সুনিতে অমৃত বড়, মক্তির আকার দঢ়, আর কোথু নাইক সংসয় ॥৬২॥
বন্ধুকুলপ্রকাশক, সত্রুকুলবিনাসক, সমুদ্রেত জেন সসধর।
লস্কর ছুটিখান, কর্ম্ম সম জার দান, মেদিনি মহিমা সমসর ॥
তাহান আদেস মাথে যুধিষ্ঠীর নবনাথে, কবিন্দ্রে জে রচিল পয়ার ॥৬৩॥
—ঐ, ২৫৫ খ পৃষ্ঠা।

(৭) শ্রীকর নন্দিএ কহে বুঝিয়া সংহিতা। যৌমিনী রচিল জেন ভারতের গাথা ॥
—ঐ, ২৫৩ ক পৃষ্ঠা।

(৮) অশ্বমেধ যজ্ঞকথা অমৃতের সার। কবিন্দ্র পরমেশ্ব[রে]র রচিল পয়ার ॥
—ঐ, ৩১৫ খ পৃষ্ঠা।

(৯) একলক্ষ নবতিন শ্লোক হৈল সার। কবিন্দ্র পরমেশ্বরে রচিল পয়ার ॥
* * * * *
লস্কর পরাগল ধর্ম্ম অবতার। জাহার আদেশে হৈল ভারত বিস্তার ॥

জে জন সম্ভ্রম বুদ্ধি না করে তাবতে। সবান্ধবে পচিব নরক রৌরবেতে ॥
ব্রাহ্মন বুদ্ধিএ জদি হাংসএ তাহাক। ধর্ম্মশাস্ত্রে কহিল নরক কুম্ভিপাক ॥
জোড় হস্তে সর্ব্বত মাগএ পরিহার। সুন সুন মহাজন বচন আক্ষার ॥
পুস্তক কারণে নাম হৈল ধরাতল। লস্কর পরাগল গুণের সাগর ॥
তাহান আদেসমাল্য মাথে আরোপীয়া। শ্রীকর নন্দিএ কহে পাঞ্চালি রচিয়া ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে পাণ্ডববিজয়ে স্বর্গারোহণ পর্ব্বঃ সমাপ্তঃ॥ শ্রীরস্তু সর্ব যগতা' শ্রীরস্তু লেখকে মর্ত্তী। শ্রীরস্তু লিখিতং যস্য তস্য কৃষ্ণপ্রসাদতঃ॥ হরএ নমঃ। * *।

শকাব্দাঃ ১৬১১ পরগনে ভুলুয়া সন ৪৮৭ তেবিখ ৭ বৈশাখ রোজ বৃহস্পতীবার দস দণ্ড গতে সমাপ্ত ॥ শ্রীকুমুদ পণ্ডীতস্য স্বকীয় পুস্তকমিদং স্বাক্ষরঞ্চ ॥

—ঐ, স্বর্গারোহণ পর্ব্ব, ৩৪২ ক পৃষ্ঠা।

শ্রীকর নন্দী ও কবীন্দ্রের ভণিতাযুক্ত পুষ্পিকা মহাভারতখানির সকল পর্ব্বেই পাওয়া যাইতেছে। এইরূপ ভণিতা যে একখানিমাত্র পুথিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা নহে। আর একখানি পুথি হইতেও কয়েকটী উদাহরণ দিলাম।

(১০) সংগ্রামে বন করএ, বনেতে পাইল ভএ, সবে মিলি রহিতে না পারে।
বাঢে আউ ধর্ম্ম জস সর্ব্বলোক হএ বস, প্রস্রএ কবিতে কোনে পারে ॥
বিজএ পাণ্ডব নাম, সর্ব্বগুনে অনুপাম, পুন্যবন্তে সুনে দুই কানে।
লস্কর জে পরাগল, প্রনমিল বহুতর, নামকির্ত্তি বাঢে দিনে দিনে ॥
শ্রীকর যে নন্দি কবি, তাহার বচন ধরি, রচিলেক পাঞ্চালি প্রকার।
কুরু পাণ্ডু সংগ্রাম, যুর্দ্ধ ছিল অনুপাম, দোন হইল জন্ম অবতার ॥

—ঢা, বি, ২০২৪ সং পুথি, দ্রোণপর্ব্ব, ২২৮ ক পৃষ্ঠা।

(১১) ভাগে ভাগে লাগে জোধ, বাহিনির বিরোধ, অস্ত্র সব এড় ঝাকে ঝাকে।
পদবন্ধ বিস্তার, কতেক লিখিব আর, কুরু পাণ্ডু যুদ্ধ পরিপা[ ]ক ॥
রুদ্রবংস জন্ম কর, সম্পদ মনিসা চর, লস্কর পরাগল খান।
পদবন্ধ সোন্দর, কবিন্দ্র পরমেশ্বর, রচিলেক ভারথ বাখান ॥
উভয় লোকের সন্ধি, পাত্রেত সুজুত বুর্দ্ধি, পুণ্যকথা অমৃতলহরি।
সুমি[লে] অধর্ম্ম ক্ষয়, সংগ্রামেত হএ জয়, সবে পিয় কর্ন্নঘট ভরি ॥

—ঐ, দ্রোণপর্ব্ব, ৩১২ খ পৃষ্ঠা (লিপিকাল ১২০৭। ২৯ ফাল্গুন)।

(১২) ভারথামৃতসির্দ্ধর্থং রম্যং বিজয়পাণ্ডবং।
পায়ং পায়মতো নিত্যং মহাকির্ত্তিপর[া]ম্বিতং ॥
শ্রীপরাগলখানস্য মহানুগ্রহগৌরবাৎ।
দেসভাসামের্ধ্যবাব্য [?] কৌতুকাদকরোৎ কবি [:] ॥

—ঐ, ১২৫ ক পৃষ্ঠা।

এই সকল বিক্ষিপ্ত ভণিতা এবং পরাগল ও ছুটিখানের নামোল্লেখ দেখিলে শ্রীকর নন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর যে অভিন্ন ব্যক্তি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও যোগ্য কারণ দেখা যায় না। সুতরাং 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' শ্রীকর নন্দীরই উপাধি। শহীদুল্লাহ সাহেব এই অনুমানই করিয়াছিলেন। দুই জন লোকে সম্মিলিত চেষ্টায় গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন বলিয়া মনে করিবারও কোনও কারণ নাই। কারণ 'ক্ষেমেন্দ্র' ও 'কেতকাদাসে'র মত যুগ্ম নাম গ্রন্থের কোনও স্থানে পাওয়া যায় নাই। যেখানে 'শ্রীকর নন্দী' আছে সেখানে 'কবীন্দ্র' বা 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' নাই; আবার যেখানে 'কবীন্দ্র' আছে, সেখানে 'শ্রীকর' নাই। আরও একটী বিকল্পের অনুমান চলিতে পারে।—পরাগলের সভায় হয় ত 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' নামক (ইংরাজী Poet Laureate এর অনুরূপ) একটী সদস্যের পদ থাকিতে পারে। কিন্তু সেটাও অনুমান মাত্র। দীনেশ বাবু শ্রীকর নন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে বিভিন্ন কাব্যের লেখক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এই সকল প্রমাণ দেখিয়া আর তাঁহার মত গ্রহণ করা যায় না। কারণ, মহাভারতখানি দুই জন লোকের সমবেত চেষ্টাতেই লিখিত হউক, আর একজনের দ্বারাই হউক, গ্রন্থখানি অভিন্ন, এবং যিনি (বা যাঁহারা) অশ্বমেধ পর্ব্ব লিখিয়াছিলেন, তিনিই (বা তাঁহারাই) অন্যান্য পর্ব্বগুলিও লিখিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবসর নাই। কিন্তু এই মহাভারতখানির প্রচারে কবি অপেক্ষা কবির উৎসাহদাতা পরাগল খানেরই গৌরব বেশী। সে কথা কবি স্বয়ং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এই মহাভারতখানিকে 'পরাগলী মহাভারত' নাম দিয়া দীনেশ বাবু সুবিচারই করিয়াছেন। কিন্তু অশ্বমেধ পর্ব্বটী ছুটিখানের নামে সংযুক্ত হইলে অভিনব পাঠকের মনে একটা সংশয়ের উৎপত্তি হইতে পারে। অথচ তাঁহার পিতৃদেবের আরব্ধ কার্য্য তিনি সম্পূর্ণ করাতে সেই কার্য্যের সহিত তাঁহার নাম সংশ্লিষ্ট না থাকিলে তাঁহার পক্ষে কোনও অবিচার হইয়াছে, এ কথা বলা যায় না। কারণ, গ্রন্থমধ্যে তাঁহার নাম আছে, এবং কবি তাঁহাকে পিতৃভক্ত পুত্র বলিয়াছেন।* সুতরাং সমগ্র মহাভারতখানিই পরাগলের নামে প্রসিদ্ধ করাই আমি সঙ্গত মনে করি। তাহাতে কবির অভিন্নত্ব বিষয়ে কোনও সংশয় থাকে না।

এই পরাগলী মহাভারতের কবি শ্রীকর নন্দীর কালনির্ণয় বিষয়ে বিশেষ কোনও গোলযোগ নাই। কারণ, কবি স্বয়ং সে বিষয় স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন।—

"বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদৌ চান্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥

প্রণমহো নারায়ণ পুরুষ প্রধান। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়েত জার অবধান ॥

সরস্বতী প্রণমহো বচনদেবতা। জাহার প্রসাদে হএ সরস কবিতা ॥

সর্ব্ব দেব [ী ?] বন্দিয়া বন্দোম দেবগণ। জনক জননী আদি বন্দো গুরুজন ॥

সভাসদ অগ্রেতে জে করো[ম] প্রণতি। রচিয়া পয়ার কিছু কহিব ভারতি ॥

---

* কপটের গন্ধ নাই প্রসন্ন হৃদয়। রামসম পিতৃভক্ত খান মহাশয় ॥

—২০২৫ সং পুথি, ২৪১ পৃষ্ঠা।

পৃথিবির মধ্যেত প্রধান এক স্থান। উপদ্রব নাই কোথু অতি পুণ্যবান ॥
নসরত সাহা নাম অতি মহারাজা। পুত্রসম রক্ষা করে সকল পরজা ॥[১]
নৃপতি হুসন-সাহা-তনয় সুমতী। সামদণ্ড ভেদে পালে সর্ব্ব বসুমতী ॥
তান এক সেনাপতি নামে ছুটিখান। ত্রিপুরা গড়েত গীয়া কৈল সন্নিধান ॥
চাটীগ্রাম নগরক উত্তর প্রধান। চন্দ্রসেখর নাম পর্ব্বতের স্থান ॥
চরো নাম নগর জে পৈতৃক বসতি। সে পুরির জত গুন কহিবম কতি ॥
আপনি মহেস তথা ক্রমতিস নাম। উনকোটী সিবলিঙ্গ বৈসে অবিরাম[২] ॥
চারি বর্ণে বৈসে প্রজা সেনাসন্নিপাত। নানা গুনবন্ত সব বৈসএ তথাত ॥
ফনি নাম নদিএ বেষ্টীত চারিধার। পূর্ব্বেত জে মহাগিরি অধিক বিস্তার ॥
দৈবের নির্ম্মাণ সে জে প্রলংঘন পুরি। আছউক সত্রুর ভয় নাই ডাকাচুরি ॥
লস্কর পরাগল খান মহাশয়[৩]। সমর বিজয়ী ছুটী খান মহাশয় ॥
আজানুলম্বিত বাহু কমল লোচন। বিশাল হৃদয় মত্ত গজেন্দ্রগমন ॥
চতুঃষষ্ঠী কলার বসতি গুণনিধি। পৃথিবিত কল্পতরু সৃজিলেক বিধি ॥
দাতা বলী-কর্ণ-সম অপার মহিমা। শৌর্য্য ধৈর্য্য গাম্ভির্য্য বির্য্যের নাই সীমা ॥
কপটের গন্ধ নাই প্রসন্ন হৃদয়। রামসম পিতৃভক্ত খান মহাশয় ॥
তাহান সহজ গুণ সুনি নরপত্তি। সম্বাদি বিসয় দিল হরষীত মতি ॥
ঘোটক পর্য্যন্ত (সহিতে ?) ক্ষিতি পাইল ছুটীখান। নৃপতি অগ্রেতে পাইল বহুল সম্মান ॥
লস্কর বিষয় পাই খান মহামতি। সামদণ্ডভেদে পালে সর্ব বসুমতী ॥
ত্রিপুরার নরপত্তি ভএ ছাড়ে দেস। পর্ব্বতকন্দরে গীয়া [২৪২ক] করিল প্রবেস ॥
গজ বাজী কর দিয়া করিল সন্ধান[৪]। মহাবনমধ্যে পুরি করিল নির্ম্মান[৫] ॥
পণ্ডিতে পণ্ডিত সভা খান মহামতী। একদিন বসি আছে বান্ধব সংহতি ॥

১। মুদ্রিত পুথিতে পাঠান্তর,—
"নসরত সাহা তাত অতি মহারাজা। রাম বহুনিষ্ঠ পালে সব প্রজা ॥
নৃপতি হুসন সাহা যেঅ ক্ষিতিপতি। সাম দান দণ্ডভেদে পালএ বসুমতী ॥"

২। অভিরাম।

৩। ৩১১ ক পৃষ্ঠার পাঠ :—
লস্কর পরাগল খানের তনয়। সমরে বিজয়ী ছুটী খান মহাশয় ॥

৪। সন্ধি।

৫। মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ,—
গজ বাজি বারি দিয়া করিল সম্মান। মহাবনমধ্যে তার পুরীর নির্ম্মাণ ॥
অদ্যাপি ভয় না দিল মহামতি। তথাপি আতঙ্কে বৈসে ত্রিপুরনৃপতি ॥
আপনি নৃপতি সম্ভর্ষিয়া বিশেষে। সুখে বসে লস্কর আপনার দেশে ॥
দিনে দিনে বাড়ে তার রাজসম্মান। যাবত পৃথিবী থাকে সন্ততি তাহান ॥

সুনন্ত ভারত পোথা অতি পুন্যকথা। মহামুনি জৈমিনিব বচিত সংহীতা ॥
অশ্বমেধ পুন্য সুনি প্রসন্ন হৃদয। সভাখণ্ডে আদেসিল খান মহাশয় ॥
ব্যাসগীত ভাবত সুনিল চারুতর। জাব হেতু জৈমিনিএ রচিলা সকল ॥
দেসি ভাষা কহি কথা রচিয়া পযাব। সঞ্চরৌ[ক] কীর্ত্তি মোর যগত সংসাব ॥
তাহান আদেশমাল্য মাথে আরোপীয়া। শ্রীকর নন্দিএ কহে পাঞ্চালি রচিয়া ॥

—ঢা. বি. ২০২৫ সং পুথি, ২৪১খ—২৪২ক পৃষ্ঠা।

এই বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্গাধিপতি নসবৎ সাহাব বাজত্বকালে ছুটীখান চট্টগ্রামেব উত্তব অঞ্চলে চন্দ্রশেখব পর্ব্বতেব নিকটে ফেণী নদীর তীরে লস্করী বিষয় পাইয়াছিলেন।[১] কিন্তু ছুটীখানেব পিতা পবাগল খাঁ হুসেন সাহাব নিকট লস্করী পাইয়াছিলেন।

"রাস্তিখানতনয় বহুল গুণনিধি। পৃথিবিতে কল্পতরু নিবমিল বিধি ॥
সুলতান হোসন পঞ্চম গৌড়নাথ। ত্রিপুরের ভাব সমর্পিল জাব হাথ ॥
সোনাব পালঙ্গি দিল এক সত ঘোড়া। সঙ্গোগু সহিতে দিল বিবিধ কাপড়া ॥
তাহান আদেস তবে সিরেত ধবিয়া। কবিন্দ্রে কহিল কথা পাচালি বচিয়া ॥
একমনে সুনে জেবা ভাবথ কথন। তাহারে সুনিলে হএ স্বর্গেত গমন ॥"

—ঢা. বি, ২০২৪ সং পুথি, ১ পৃষ্ঠা।

হুসেন সাহাব বাজত্বকাল ১৪৯৪—১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ, এবং নসরত সাহাব বাজত্বকাল ১৫২০—২৫ খ্রীষ্টাব্দ। সমগ্র মহাভাবতখানি লিখিতে যদি তিন বৎসব (অর্থাৎ প্রতি পর্ব্বে গড়ে দুই মাস) কাল সময লাগিয়া থাকে, এবং তাহাব শেষভাগ নসবত সাহাব বাজ্যকালে পড়ে, তাহা হইলে মহাভাবতখানিব বচনাকাল ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দেব নিকটবর্ত্তী হয। কিন্তু পরাগল খাঁব মৃত্যু কোন্ সময়ে হইয়াছিল, তাহা আমবা নিশ্চিতরূপে জানি না। কিন্তু সে ঘটনা যে নসবত সাহাব রাজত্বকালেই সংঘটিত হইযাছিল, তাহা ছুটীখানেব লস্করী প্রাপ্তি বিষয়ে কবির উক্তি হইতেই জানা যায। যদি এই ঘটনা নসবত সাহাব বাজত্বকালের অবসানের (১৫২৫ খ্রীঃ) নিকটবর্ত্তী হয, তাহা হইলে গ্রন্থখানিব বচনাকালও ঐ সময়ের নিকটবর্ত্তী হয়। যদিও পরাগল হুসেন সাহাব নিকট হইতে লস্কবী পাইয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তথাপি গ্রন্থারম্ভ হুসেন সাহার রাজত্বকালে নাও হইয়া থাকিতে পারে। এমত অবস্থায় গ্রন্থবচনার কাল নসবত সাহার সময়ে বলিয়া ধরিলেই ভ্রমের সম্ভাবনা অল্প হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, গ্রন্থরচনাকালেব সহিত নসরত সাহাব বাজত্বকালই সুস্পষ্ট ভাবে বিজড়িত দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু হুসেন সাহার রাজত্বকালে গ্রন্থারম্ভ হইবার বিষয়ে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

১। মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ অনুসারে এই ব্যাপারটা নসরত সাহার পিতা হুসেন সাহার সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকের ভাষার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় যে, উহার পাঠ সম্ভবতঃ ভ্রমাত্মক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫ সংখ্যক পুথির পাঠ যেরূপ সরল, তাহাতে এই পাঠই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ কষ্টকল্পিত।

দীনেশ বাবু পরাগলী মহাভারতের রচনাকাল ১৪৯৫—১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়াছেন[১] কিন্তু উল্লিখিত প্রমাণসমূহ তাঁহার মতের অনুকূল নহে। মোট কথা, এই মহাভারতের রচনা ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দের দুই তিন বৎসর পরে হইয়াছিল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

শহীদুল্লাহ সাহেব মনে করিয়াছিলেন যে, প্রথমে অশ্বমেধপর্ব্ব লিখিয়া শ্রীকর নন্দী 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, এবং তৎপরে অন্যান্য পর্ব্বগুলি লিখিবার সময়ে তাঁহার এই উপাধি ভণিতাস্থলে ব্যবহার করিয়াছিলেন[২]। তাঁহার এই অনুমানের কারণস্বরূপে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, "পরাগলী মহাভারতে 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' এই ভণিতা দেখিতে পাই। তাহাতে 'শ্রীকর নন্দী' এই নাম পাওয়া যায় না।" কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই যে সকল ভণিতা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই দেখা যায় যে, পরাগালী মহাভারতের সর্ব্বত্রই 'শ্রীকর নন্দী' নাম পাওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত ভণিতাগুলির মধ্যে (১), (৭), (৯) ও (১০) সংখ্যক ভণিতা দ্রষ্টব্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিগুলি পাঠ করিয়া দেখা যাইতেছে যে, কবি সপ্তদশ পর্ব্ব মহাভারত সম্পূর্ণ করিয়া সর্ব্বশেষে অশ্বমেধপর্ব্ব লিখিয়াছিলেন। অশ্বমেধপর্ব্ব আরম্ভ করিয়া কবি পরীক্ষিতের জন্ম উপাখ্যান শেষ করিবার পর বোধ হয়, পরাগল খাঁর মৃত্যু ঘটিয়াছিল। উদ্ধৃত (৫) সংখ্যক ভণিতা ও লিপিকরের পুষ্পিকা দ্রষ্টব্য। অশ্বমেধপর্ব্বের অবশিষ্টাংশ পরাগলপুত্র ছুটীখানের সভায় পঠিত হইয়াছিল। অশ্ব[illegible] পর্ব্বের এই দ্বিতীয় অংশ পরিষৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কবি শ্রীকর নন্দী [illegible] অশ্বমেধপর্ব্ব সর্ব্বশেষে লিখিয়াছেন, তাহার একটা কারণ বা কৈফিয়ৎ অশ্বমেধপর্ব্বের শেষে কবির পুষ্পিকায় পাওয়া যায়। বোধ হয়, অশ্বমেধ যজ্ঞের অবসানে যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক ব্যাসদেবকে প্রদত্ত দক্ষিণার অনুরূপ ভূরি দক্ষিণা আদায় করাই কবির উদ্দেশ্য ছিল।

"অশ্বমেধ শেষ না আছিল যে কারণ। কবিন্দ্রে রচিল গাথা লিখিতে কারণ॥
হেন মতে অশ্বমেধে হইলেক প্রাপ্তি। জৈমিনীএ হেন মত রচিল ভারতী॥
যজ্ঞ অবশেষ ধর্ম্মরাজা করে দান। সুবর্ণ সহস্র কোটী দক্ষিণা প্রধান[৩]॥
চারি চারি ব্রাহ্মণেরে দিল চারি দান। ব্যাসের স্থানেত বসুমতী কৈল দান॥
লইল পৃথিবিদান পরাসরসুত। সবিস্ময়ে সর্ব্বলোক চাহে অদভুত॥
ধরা লই ব্যাস মুনি হরষীত মন। ধর্ম্মরাজা সম্বোধিয়া কহিলা বচন॥
মুনি কৈল পৃথিবি তোম্মাক দিল পুনি। পৃথিবির মুল্য ধন দেয়[৪] মনে গুনি॥
যুধিষ্ঠীরে কহন্ত না হএ সমুচিত। পৃথিবি দক্ষিণা অশ্বমেধের উচিত[৫]॥"

—২০২৫ সং পুথি, ৩১৫ ক পৃষ্ঠা।

১। বঙ্গসাহিত্যপরিচয়, ৬১৭—১৯ পৃঃ। ২। প্রতিভা, ১৩৩১, ১৬০ পৃঃ। ৩। প্রদান। ৪। দাও।

৫। মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ (১৩৯—৪০ পৃঃ):—

অশ্বমেধ শেষ আছিল যে কথন। কবীন্দ্ররচিত গাথা লিখিত কারণ॥
হেনমতে অশ্বমেধ হইল সমাপ্তি। জয়মুনি যেমন রচিল ভারথি॥
[অশ্বমেধ পুণ্যকথা অমৃতলহরী। শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক তরি॥

পরাগলী মহাভারতের রচয়িতা শ্রীকর নন্দীর বিষয়ে এই কয়টী কথা নির্দ্দিষ্টভাবে জানা যাইতেছে :—

(১) শ্রীকর নন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক দুই জন কবির সত্তা স্বীকার করিবার অনুকূল প্রমাণ নাই।

(২) শ্রীকর নন্দী সমগ্র মহাভারত লিখিয়াছিলেন ; এবং অশ্বমেধপর্ব্ব সর্ব্বশেষে লিখিয়াছিলেন।

(৩) চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা পরাগল খাঁ ও তৎপুত্র ছুটীখানের সভায় কবি তাঁহার মহাভারত পাঠ করিয়াছিলেন।

(৪) অশ্বমেধপর্ব্বের 'পরীক্ষিতের জন্ম' শেষ হইবার পর সম্ভবতঃ পরাগলের মৃত্যু হইয়াছিল। ঐ পর্ব্বের অবশিষ্টাংশ ছুটীখানের সভায় পঠিত হইয়াছিল। মুদ্রিত অশ্বমেধ পর্ব্বে 'পরীক্ষিতের জন্ম' শীর্ষক আখ্যানটী নাই।

(৫) এই গ্রন্থের রচনা-কাল সম্ভবতঃ ১৫২২—২৫ খ্রীষ্টাব্দ।

(৬) শ্রীকর নন্দীই সম্ভবতঃ বঙ্গীয় মহাভারতের আদিকবি[১]।

কাশীরাম দাসের মহাভারতের যেমন একটী অতি-পরিচিত পুষ্পিকা-শ্লোক—"মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥" শ্রীকর নন্দীরও সেইরূপ একটী পুষ্পিকা-শ্লোক দেখা যায়,—

"বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃতলহরি। শুনিলে অধর্ম্ম হবে পরলোকে তরি॥"

এই পুষ্পিকাটি পরাগলী মহাভারতে এত অধিকবার ব্যবহৃত হইয়াছে যে, কোনও একটী খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন মহাভারতের পত্রে এই পুষ্পিকা পাওয়া গেলে, সেই পত্রটীকে পরাগলী মহাভারতের একখানি ছিন্ন পত্র বলিয়া গ্রহণ করা যায়। শ্রীকৃষ্ণবিজয়, গোরক্ষবিজয় প্রভৃতি গ্রন্থনামে যেমন 'বিজয়' শব্দের প্রতি একটা পক্ষপাত দেখা যায়, এ স্থলেও তাহাই দেখা যায়। শ্রীকর নন্দীর নিকট মহাভারতের নামান্তর 'পাণ্ডব-বিজয়'; এই 'পাণ্ডববিজয়' শব্দ প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে গদ্য পুষ্পিকায় 'ইতি শ্রীমহাভারতে পাণ্ডববিজয়ে কর্ণপর্ব্বণি দ্বিতীয়-দিবসীয়যুদ্ধে দুঃশাসনবধঃ' ইত্যাদিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই পুষ্পিকা ছাড়া পরাগলী

এহিরূপে অশ্বমেধ হইলেক শেষ। অশেষ প্রকাশ করি করিল বিশেষ॥]
যজ্ঞশেষে রাজা করয়ে দান। সুবর্ণ সহশ কোটি করিলেক দান॥
চারি চারি বিপ্রেরে জে এহি দান দিল। বসসেরে (?) দক্ষিণা তবে বসুমতী দিল॥
না লইল পৃথিবী দান * * মোর সুত। সবিস্ময় সর্ব্বলোক চাহএ অদভুত॥
ধরা লইয়া ব্যাস মুনি আনন্দিত হইয়া মন। ধর্ম্মরাজা সম্বোধিয়া বুলিল বচন॥
অস্তি করি পৃথিবী তোহ্মারে দিল পুনি। পৃথিবীর সব ধন দেয় মনে গনি॥
যুধিষ্ঠিএ বোলিল না হএ কদাচিত। পৃথিবী দক্ষিণা অশ্বমেধ সমুচিত॥

১। এই প্রবন্ধের পরবর্ত্তী অংশ দ্রষ্টব্য।

মহাভারতে আরও কয়েকটী লাচাড়ীর পুষ্পিকা পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল পুষ্পিকার ভাষায় কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। 'শ্রবণ-কলস ভরিয়া' অথবা 'কর্ণঘট ভরিয়া' ভারতসুধা পান করিবার উপদেশ এই সকল পুষ্পিকায় পাওয়া যায়। (৪) ও (১১) সংখ্যক ভণিতা দ্রষ্টব্য। লিপিকরপ্রমাদবশতঃ এই সকল পুষ্পিকা কোনও কোনও পুথিতে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। "বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত" নামক যে মহাভারতখানি পরিষৎ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও এইরূপ একটা ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই গ্রন্থখানিতে মোট ষোল জায়গায় শ্রীকর নন্দীর 'বিজয়পাণ্ডব' পুষ্পিকা ভণিতার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে এগারোটা জায়গায় শ্রীকরের ভণিতি-পুষ্পিকা অবিকৃত অবস্থায় আছে, কেবল পাঁচ জায়গায় 'বিজয়পাণ্ডব' 'বিজয়পণ্ডিতে' রূপান্তরিত হইয়াছে। বিজয় পণ্ডিতের মুদ্রিত মহাভারতের দ্বিতীয় খণ্ড ২৫৮ ৫৯ পৃষ্ঠায় এই প্রবন্ধের (৪) সংখ্যক ভণিতার 'শ্রবণ কলস' 'সুবর্ণ কলস' এবং 'মহাজন' 'মহাজল' হইয়াছে। এটা কি লিপিকরপ্রমাদ? না মুদ্রাকরপ্রমাদ?

"বিজয় পাণ্ডব নাম, পুণ্যকথা অনুপাম, অমৃতে বরিষে নিরন্তর।
সুবর্ণ কলস ভরি, মহাজল পান করি, কখন না যায় যমঘর॥"

পূর্ব্বোল্লিখিত (৪) সংখ্যক ভণিতাটীও যেমন কর্ণপর্ব্বের শেষে ব্যবহৃত হইয়াছে, বিজয় পণ্ডিতের এই 'সুবর্ণ কলস' ভণিতাটীও ঠিক সেই স্থলেই পাওয়া যাইতেছে। এই 'বিজয়পাণ্ডব নাম, পুণ্যকথা অনুপাম' ইত্যাদি পুষ্পিকাটী বিজয় পণ্ডিতের মুদ্রিত মহাভারতের প্রথম খণ্ডে ৫৬ পৃষ্ঠায় সভাপর্ব্বের শেষে বিকৃত আকারে মুদ্রিত হইয়াছে :- -

"বিজয় পাণ্ডব নাম, সভাপর্ব্ব অনুপাম, অমৃতলহরী বরিষণ (?)।
এহি পর্ব্ব ইতিহাস, শুনিলে কলুষ নাশ, বিজয় পণ্ডিতের সুবচন॥"

ঐ মুদ্রিত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৯৩ পৃষ্ঠায় বিরাট পর্ব্বের শেষে 'বিজয় পাণ্ডবকথা,' 'বিজয় পণ্ডিতকথা' হইয়া গিয়াছে :—

"শ্রবণে অধর্ম্ম হরে পরলোকে গতি। বিজয় পণ্ডিতকথা অমৃতভারতী॥"

শ্রীকর নন্দীর আর একটী পরিচিত পুষ্পিকা,—"ভারতের পুণ্যকথা অমৃতের ধার। ইহ-লোক পরলোক উভয় উদ্ধার॥" মুদ্রিত বিরাট পর্ব্বের শেষে (প্রথম খণ্ড, ২২৬ পৃষ্ঠায়) এই পুষ্পিকাটীও বিকৃত হইয়াছে :—

"বিজয় পণ্ডিত নাম (?) অমৃতের ধার। ইহলোক পরলোক করে উপকার॥"

এখানে কি ইষ্টনাম ত্যাগ করিয়া বিজয় পণ্ডিতের নাম গ্রহণের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে? আবার মুদ্রিত গ্রন্থের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠায় (দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৬২ পৃষ্ঠায়) এবং প্রথম খণ্ডের ১৬১ পৃষ্ঠায় বনপর্ব্বশেষে নিম্নলিখিত বিকৃত পুষ্পিকা দুইটী পাওয়া যাইতেছে :—

"বিজয় পণ্ডিতের কথা অমৃত সমান। শুনিলে অধর্ম্ম হরে পায় পরিত্রাণ॥" (২।৩৬২ পৃঃ)
"শুন কথা ভারতের পণ্ডিত বিজয় (?)। রচিল মহামুনি বনপর্ব্ব সায়॥ (১।১৬১ পৃঃ)

এই পাঁচটী বিকৃত ও অধিকাংশ স্থলে অর্থশূন্য পুষ্পিকা হইতেই বিজয় পণ্ডিত নামক একজন কবির উদয় হইয়াছে মনে হয় না কি? ইহা ছাড়া বিজয় পণ্ডিতের আর ত কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। মুদ্রিত গ্রন্থের সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর অঞ্চলে প্রাপ্ত একখানি খণ্ডিত পুঁথিতে দ্রোণপর্ব্বের শেষে 'মেলাধিপ শ্রীবিজয় পণ্ডিতবিরচিতে বিজয়-পাণ্ডবে দ্রোণপর্ব্ব' এইরূপ একটী লেখা পাইয়া, কুলগ্রন্থসমূহের সমুদ্র মন্থনপূর্ব্বক এই 'বিজয়'-চন্দ্রের সপ্তদশ উর্দ্ধতন পুরুষের নামোদ্ধার সহ ইঁহাকে সাগরদীযার বন্দ্যবংশে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে বসাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইনি 'মসী'গোত্রে 'লেখনী'ক্ষেত্রে 'অনবধানতা'র গর্ভে উদ্ভূত কোনও 'অদ্ভুত', না প্রকৃত মনুষ্যজন্ম ইনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—সে বিষয়ের কোনও স্থির মীমাংসা না করিয়াই সম্পাদক মহাশয় ইঁহাকে ব্রাহ্মণ-জন্ম দান করিয়াছেন।

দীনেশ বাবু কবীন্দ্র পরমেশ্বররচিত মহাভারত ও বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতকে 'প্রকৃত-পক্ষে এক পুস্তক বলিয়া' মনে করেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"কবীন্দ্র পরমেশ্বরের ভণিতায় 'বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃতলহরী' পদটি একটি মূর্খ লিপিকরের হস্তে 'বিজয়পণ্ডিতকথা অমৃতলহরী' হইয়া গিয়াছিল[১]। শহীদুল্লাহ সাহেবও দীনেশ বাবুর সহিত ঐকমত্য প্রকাশ করিয়াছেন[২]। কিন্তু বিজয় পণ্ডিতের পুথি ত একখানিমাত্র পাওয়া যায় নাই,—প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত তিনখানি পুথি (তন্মধ্যে একখানি মাত্র সম্পূর্ণ) পাইয়া মুদ্রিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরবঙ্গীয় খণ্ডিত পুথিখানির পাঠ অপর দুইখানি পুথির পাঠের সহিত অধিকাংশ স্থলেই মিলে নাই। এই তিনখানি পুথি ব্যতীত আরও দুইখানি খণ্ডিত পুথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগৃহীত হইয়াছে।[৩] সুতরাং মোট পাঁচখানি পুথির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কেবলমাত্র ভণিতা দিয়া বিচার করিলে এই পুথিগুলিকে পরাগলী মহাভারতের অসম্পূর্ণ পুথি বলিয়াই স্থির করা যায়। কিন্তু একমাত্র ভণিতাই কোনও গ্রন্থের সর্ব্বস্ব নহে। গ্রন্থের ভাষা বিচার এ ক্ষেত্রে একান্ত আবশ্যক। এই জন্য আমি মুদ্রিত বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের সহিত পরাগলী মহাভারতের পাঠ অনেক স্থলে মিলাইয়া দেখিয়াছি। বনপর্ব্বের প্রথম ২০০ পংক্তির পাঠ পরাগলী ভারত ও সঞ্জয়ী ভারতের পাঠের সহিত আশ্চর্য্যরূপে মিলিয়া গেল। স্থানে স্থানে অতি সামান্য পাঠান্তর দেখা গেল। এই জন্য সমস্ত গ্রন্থখানি মিলাইয়া দেখিবার প্রবৃত্তি হইল। মোটের উপর দেখা গেল, অধিকাংশ স্থলেই ছত্রে ছত্রে মিল আছে। কিন্তু অনেক স্থলেই পাঠ সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। সুতরাং পাঠ

১। ব ভা ও সা (৪) ৪২৬-২৭ পৃঃ। ২। প্রতিভা, ১৩৩১, ১৬১ পৃঃ।

৩। এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পর পুথি দুইখানি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। ১১৭৬ সংখ্যক পুথিখানি ভীষ্মপর্ব্বের খণ্ডিত পুথি। ২০৩০ সংখ্যক পুথিখানি স্বর্গারোহণ পর্ব্বের সমগ্র পুথি। দুইখানিই বিজয়-পণ্ডিতের মহাভারতের ন্যায় সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। দুইখানিতেই পর্ব্বশেষে ভণিতার পরিবর্ত্তে "বিজয়পাণ্ডবকথা অমৃতলহরী। শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি"॥ পুষ্পিকা আছে।

হিসাবে বিচার করিলে বিজয় পণ্ডিতের নামে প্রচলিত পুথিগুলিকে পরাগলী মহাভারতেরই একখানি সংক্ষিপ্ত সংকলন বলা যায়। কিন্তু বিভিন্নতাও যে নাই, তাহা নহে। অনেক স্থলে উপাখ্যানভাগেই বিভিন্নতা দেখা যাইতেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, (১) মহাভারতের উৎপত্তি বিষয়ে জন্মেজয়ের প্রতি ঋষ্যশৃঙ্গের অভিশাপবিষয়ক আখ্যায়িকাটী[১] বিজয়ের ভারতে নাই; (২) জাহ্নবীর বানর পতি বা শান্তনুর পূর্ব্বজন্মবিষয়ক আখ্যায়িকাটীও বিজয়ভারতে পরিত্যক্ত হইয়াছে; (৩) শকুন্তলার উপাখ্যানটী সর্ব্বতোভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে; (৪) লঙ্কাবিজয়প্রয়াসী অর্জ্জুন ও লঙ্কারক্ষক হনুমানের প্রসঙ্গটীও বাদ গিয়াছে, কিন্তু বনপর্ব্বে ভীম ও হনুমানের প্রসঙ্গে (১৪৭—১৫০ পৃঃ) অর্জ্জুনপ্রসঙ্গের ভাব ও ভাষার অনেকটা মিল দেখা যায়; (৫) খাণ্ডবদাহকালে নাগিনী ও তৎপুত্র সহ অর্জ্জুনের যুদ্ধপ্রসঙ্গ প্রভৃতি অনেক প্রসঙ্গই বিজয়ভারতে পরিত্যক্ত হইয়াছে দেখা যায়। এক কথায় বলিতে গেলে বিজয় পণ্ডিতের নামে প্রচলিত মহাভারতখানিতে পরাগলী মহাভারতের অনেক প্রসঙ্গ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। পরিবর্ত্তিত প্রসঙ্গ প্রায়ই দেখা যায় না।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ও পরাগলী ভারত ও সঞ্জয়ী ভারতের সহিত বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের ভাব ও ভাষার মিল লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মিল দেখিয়া তাঁহার অনুমান হইয়াছিল যে, কবীন্দ্র পরমেশ্বর বিজয় পণ্ডিতের 'বিজয় পাণ্ডবকথা' অবলম্বন করিয়া অতিরিক্ত কিঞ্চিৎ বিষয় সংযোজনা ও কাব্যরসের বিকাশ দ্বারা তাঁহার পরাগলী মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের মতে সঞ্জয় ও শ্রীকর নন্দী চোর, এবং বিজয় মূল সম্পত্তির মালিক ও মহাজন। তিনি বলেন:—

"ভারতের প্রথমাংশ বাদ দিয়া কৌরব ও পাণ্ডবগণের উৎপত্তি হইতে স্ত্রীপর্ব্ব পর্য্যন্ত সঞ্জয় যেরূপভাবে ও যেরূপ ভাষায় রচনা করিয়াছেন, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, বিজয় পণ্ডিতের রচনা-মধ্যেও আমরা ঐরূপ ভাব ও ভাষার ঐক্য পদে পদে পাইয়াছি। এমন কি, অনেক স্থলে শ্লোকে শ্লোকে, কথায় কথায় মিল রহিয়াছে; এরূপ অপূর্ব্ব একতা বিরাট পর্ব্ব হইতেই সমধিক লক্ষিত হয়। দেখিলেই বোধ হইবে যেন, একই ব্যক্তির কর-কমল-বিনিঃসৃত। বিষ্ণুপুর হইতে সংগৃহীত বিজয় পণ্ডিতের পুথি এবং চট্টগ্রাম হইতে সংগৃহীত সঞ্জয়ের পুথি —উভয়ের স্থান কত দূরদেশ ও কত বর্ষ ব্যবধান, কিন্তু কি অপূর্ব্ব শ্লোকসাদৃশ্য! কেহ কি ভ্রমেও মনে করিতে পারেন, পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন কবি, পশ্চিমবঙ্গে নামান্তর গ্রহণ করিয়া উদিত হইয়াছিলেন? অথবা একজন অপরের কীর্ত্তি নিজনামে ঘোষণা করিয়া থাকিবেন? এরূপ পর-কীর্ত্তি-বিলোপ-প্রকৃতি প্রাচীন সাহিত্যিক বঙ্গেও কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল?

"দীনেশবাবু দেখাইয়াছেন, সঞ্জয় কবীন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী, সুতরাং চারি শত বর্ষেরও পূর্ব্বতন। এ দিকে যদি বিষ্ণুপুরের পুথিখানিতে কিছুমাত্র মৌলিকত্ব থাকে, তাহা হইলে মেলাধিপ

১। এই প্রবন্ধের পরবর্ত্তী অংশ দ্রষ্টব্য।

বিজয় পণ্ডিতকেও আমরা চারি শত বর্ষেরও কিঞ্চিদধিক পূর্ব্বতন বলিয়া অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারি। সুতরাং বিজয় ও সঞ্জয় উভয়েই চারি শত বর্ষের অগ্রবর্ত্তী হইতেছেন। একজনের খ্যাতি রাঢ়দেশে ও অপরের খ্যাতি সুদূর চট্টগ্রামে। অথচ উভয়ের রচনার ছত্রে ছত্রে পদে পদে এরূপ অপূর্ব্ব মিল হইবার কারণ কি? সুবিজ্ঞ সমালোচক উভয়েরই রচনা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে স্বীকার করিবেন, এক ব্যক্তি রচনা করিয়াছেন, অপর ব্যক্তি তাহাই নকল করিয়াছেন।

* * * * *

"যাহাই হউক, সঞ্জয়ের গ্রন্থে খাঁটী সোণায় রাঙ্‌তা জড়ান থাকায় ইহার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সহজেই সন্দেহ উপস্থিত হয়। বিজয় পণ্ডিতের সরল ও অতি সংক্ষিপ্ত আখ্যান এবং মূলের সহিত কোনও প্রকার বিরোধ না থাকায় বিজয়ের যত্নের ধন বঙ্গভাষার আদি ও অকৃত্রিম বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি থাকিতেছে না।

* * * * *

"পরাগলী ভারত প্রায় ১৭০০০ শ্লোকে পূর্ণ। আর বিজয় পণ্ডিতের "বিজয় পাণ্ডবকথা" প্রায় ৮০০০ শ্লোকে সমাপ্ত। * * *। এত সংক্ষেপে মূল মহাভারতের বিষয় আর কেহ তৎপূর্ব্বে বর্ণনা করেন নাই। সম্ভবতঃ সেই সংক্ষিপ্ত ভারতকথাই কবীন্দ্র পরমেশ্বরের লেখনীতে দ্বিগুণায়তন লাভ করিয়াছে।"—মুদ্রিত মহাভারতের মুখবন্ধ।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বিজয় পণ্ডিতের সপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থের সরলতা ও সংক্ষিপ্ততা। সংক্ষিপ্ত হইলেই কাব্যখানিকে আদিকাব্য, এবং বিস্তারিত ও বৃহদায়তন হইলেই তাহাকে সেই আদিকাব্যের বিকাশ বলিয়া গ্রহণ করা যায় কি? লঘুকৌমুদী ত সিদ্ধান্তকৌমুদীর পূর্ব্ববর্ত্তী কালের গ্রন্থ নহে; 'লঘুভাগবত' গ্রন্থ ভাগবত গ্রন্থের মূল নহে; বাল্মীকীয় রামায়ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণের, অথবা ব্যাস-মহাভারত বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের বিকাশ নহে। বিজয় পণ্ডিতের নামে প্রচলিত গ্রন্থে যাহা আছে, সঞ্জয় ও পরাগলীতে তাহা আছেই, এবং তদতিরিক্তও কিছু আছে। ইহা হইতে দুইটী অনুমান মনে আসে—(১) বড়টী ছোটটীর বিকাশ, অথবা (২) ছোটটী বড়টীর সংক্ষেপ। বড়টীকে ছোটটীর বিকাশ বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে দুইটীকেই দেশ ও কালের গণ্ডীর মধ্যে এমনভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া জানা চাই, যাহাতে স্বাভাবিক কারণবশতঃ ছোটটীর বড়টীতে পরিণতি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বিজয় পণ্ডিতকে রাঢ়ে ও সঞ্জয় এবং কবীন্দ্রকে চট্টগ্রামে পাঠাইয়া বিজয়ের সহিত সঞ্জয় বা কবীন্দ্রের সম্পর্ক অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু বিজয় পণ্ডিতের যে পুথি তিনি তাঁহার পাত্রসায়েরনিবাসী পুথিসংগ্রাহক রামকুমার দত্তের নিকট পাইয়াছিলেন, তাহা যে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে কোনও লিপিকর কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল কি না, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। কারণ, পুথিখানি খণ্ডিত বলিয়া তাহাতে লিপিকরপুষ্পিকা পাওয়া যায় নাই। বিজয় পণ্ডিতের আর কোনও পুথি পশ্চিমবঙ্গ হইতে আবিষ্কৃত হয় নাই। বিজয় পণ্ডিতের নামে

প্রচলিত মহাভারতের পুথিখানির রাঢ়ে অবস্থান ব্যতীত বিজয় পণ্ডিতের আর কোনও বিবরণ আমরা পাই নাই। সুতরাং মাহেশের নির্দ্দোষ কুলপঞ্জিকা ও ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশাবলীতে যে সাগরদীয়ার বন্দ্যবংশীয় বিজয় পণ্ডিতের উল্লেখ আছে, তাহার উপর এই পূর্ব্ববঙ্গীয় মহাভারতখানির গ্রন্থকর্ত্তৃত্ব আরোপ করা চলে না। পূর্ব্ববঙ্গেই বিজয় পণ্ডিতের নামে প্রচলিত মহাভারতের সব পুথিগুলিই পাওয়া গিয়াছে; পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত পুথিখানি বাস্তবিক পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সংগৃহীত, না পশ্চিমবঙ্গ হইতে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে; কারণ, লিপিকরপুষ্পিকা পাওয়া যায় নাই। আরও দেখা গিয়াছে যে, পাঁচটী বিকৃত ভণিতা হইতে কষ্টকল্পনা দ্বারা বিজয় পণ্ডিতের উৎপত্তি হইয়াছে। অথচ এগারোটী ভণিতি-পুষ্পিকা ঐ গ্রন্থেই অবিকৃতভাবে স্থান পাইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উল্লিখিত পাঁচটী বিকৃত ভণিতার মধ্যে কেবলমাত্র একটীর (৫৬ পৃঃ) পাঠান্তর পাওয়া গিয়াছে,—"বিজয় পণ্ডিতের রচন"। "বিজয় পণ্ডিত নাম অমৃতের ধার। ইহলোক পরলোক করে উপকার॥"—এই পাঠটী যে ভ্রমাত্মক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আসিতেই পারে না। কারণ, বিজয় পণ্ডিত তাঁহার নিজের নামটীকে ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় জপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া মনে করা যায় না। "শুন কথা ভারতের পণ্ডিত বিজয়"—এইটীও ভ্রমাত্মক পাঠ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, পরবর্ত্তী পংক্তিতেই রচয়িতার নাম 'মহামুনি' (= ব্যাসদেব) আছে। এইরূপ বিকৃতিপ্রাপ্ত পাঠগুলির কোনটীকেই প্রকৃতিস্থ পাঠ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। প্রথম খণ্ডের ৫৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত "বিজয় পণ্ডিতের সুবচন" বা তাহার পাঠান্তর "বিজয় পণ্ডিতের রচন" যে লাচাড়ীর শেষভাগে স্থান পাইয়াছে, সেই লাচাড়ীর শেষে পরাগলী মহাভারতের পাঠ নিম্নরূপ :—

> "সুনিলে অধর্ম্ম ক্ষয়, সংগ্রামেত হএ জয়, আইউ জস বাঢএ বিসেষে।
> বিজয় পাণ্ডব নাম, ধর্ম্মকথা অনুপাম, সর্ব্বকাল অমৃত বরিসে॥"

ইহারই স্থলে মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ হইয়াছে :—

> "বিজয় পাণ্ডব নাম, সভাপর্ব্ব অনুপাম, অমৃতলহরী বরিষণ।
> এহি পর্ব্ব ইতিহাস, শুনিলে কলুষনাশ, বিজয় পণ্ডিতের সুবচন॥"

এবম্বিধ অবস্থায় বিজয় পণ্ডিতের বিষয়ে এই কথাগুলি জানা যাইতেছে :—

(১) কবি বিজয় পণ্ডিতের নাম ভ্রান্তিপ্রসূত। তাঁহার অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ নাই।

(২) বিজয় পণ্ডিতের নামযুক্ত পুথি পূর্ব্ববঙ্গেই পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে যে একখানি-মাত্র পুথি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, লিপিকরপুষ্পিকার অভাবে তাহার প্রাপ্তিস্থান বিষয়ে সন্দেহ আছে।

(৩) চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে লিখিত কুলজীগ্রন্থদ্বয়ে উক্ত পশ্চিমবঙ্গীয় বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত এই পূর্ব্ববঙ্গীয় মহাভারতের সম্পর্ক স্থাপন সম্ভবপর নহে।

(৪) বিজয় পণ্ডিতের নামে প্রচারিত মহাভারতের ভাষা পরাগলী মহাভারতের ভাষার সহিত ছত্রে ছত্রে মিলিয়া যায়।

(৫) ভাষার মিল দেখিয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় নিত্যানন্দ ঘোষ, নন্দরাম দাস, দ্বৈপায়নদাস প্রভৃতি যে সকল কবিকে বিজয় পণ্ডিতের অনুকরণকারী বলিয়াছেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ পরাগলীর অনুকরণ করিয়াছেন।

(৬) বিজয় পণ্ডিতের নামে প্রচারিত মহাভারত পরাগলীরই সংক্ষিপ্তসার।

অতঃপর সঞ্জয়ের কথা। দীনেশবাবু সঞ্জয়ী মহাভারত ও পরাগলী মহাভারতের মধ্যে প্রভেদ রক্ষার জন্য যে সকল চেষ্টা করিয়াছেন, সে সকল চেষ্টার কোনটীতেই তিনি সফল হইতে পারেন নাই। যদিও তিনি সঞ্জয়কে আদিকবির বহুমান্য আসন ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন যে, সঞ্জয়ের কবিত্বের বিকাশ কবীন্দ্রের ভারতে দৃষ্ট হয়, তথাপি তিনি তাঁহার উক্তির পোষক প্রমাণ দিতে পারেন নাই। সঞ্জয়ের ভারতের ভাব ও ভাষার বিকাশ কবীন্দ্রের ভারতে দৃষ্ট হয় বলিয়া তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের (৪র্থ সং) ১৩৬ পৃষ্ঠায় "এক দিন দেবযানি, হৃদয়ে হরিষ গুণি, শর্ম্মিষ্ঠা লইয়া রাজ-সুতা" ইত্যাদি যে লাচাড়ীটী উদ্ধৃত করিয়া কবীন্দ্রের কবিত্বের নমুনা দেখাইয়াছেন, সেই লাচাড়ীটীই তাঁহার বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় গ্রন্থের ৬৯১—৯৩ পৃষ্ঠায় গঙ্গাদাস সেনের রচনা বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। আমিও পরাগলী মহাভারতের দুইখানি পুথিতেই গঙ্গাদাস সেনের ভণিতা সহ ঐ লাচাড়ীটীই দেখিতে পাইয়াছি। সুতরাং এ লাচাড়ীটী সঞ্জয়ী ভারত ও কবীন্দ্রের ভারতের প্রভেদ প্রমাণের পোষকতা করিতেছে না। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ১৩৯ পৃষ্ঠায় সঞ্জয়ের কবিতার আদর্শস্বরূপ উদ্ধৃত "রাজার আদেশ পাই, দুঃশাসন গেল" ইত্যাদি লাচাড়িটী পরাগলী মহাভারতে (ঢা, বি, ২০২৪ সং পুথির ১২৬—২৮ পত্রে), সঞ্জয়ী ভারতে (ঢা, বি, ১৫৫০ সং পুথির সভাপর্ব্ব, ১১ খ পৃষ্ঠায়) এবং বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতে (মুদ্রিত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, ৫১ পৃষ্ঠায়) পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং এটীও সঞ্জয়ের নিজস্ব নহে। কবীন্দ্রের কবিত্বের নমুনা দেখাইবার সহজ স্থল বাছিয়া তিনি তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ১৪৫ পৃষ্ঠায় "তার পাছে দ্রৌপদী সৈরন্ধ্রীরূপ ধরি" ইত্যাদি যে পদ্যাংশটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেটী পরাগলীতে (ঢা, বি, ২০২৪ সং পুথি, ১৪২ খ পৃঃ), সঞ্জয়ে (ঢা, বি, ১৫৫০ সং পুথি, বিরাটপর্ব্ব, ৬ক পৃষ্ঠায়) এবং বিজয় পণ্ডিতের মুদ্রিত মহাভারতে (প্রথম খণ্ড, ১৬৯—৭০ পৃষ্ঠায়) পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং এই পদ্যাংশ দ্বারাও সঞ্জয় ও কবীন্দ্রভারতের প্রভেদ প্রমাণিত হইল না। উল্লিখিত গঙ্গাদাস সেনের ত্রিপদীটীর নীচে (ব. ভ: সা. ১৩৭ পৃঃ) দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—

"এইরূপ অনেক স্থলেই কবীন্দ্র সঞ্জয়ের তুলি ধরিয়া চিত্রগুলি বিকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীহরি যে স্থলে স্ব-প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া রোষক্ষিপ্ত গজেন্দ্রবৎ ভীষ্মকে বধ করিতে সমরক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন,—কবীন্দ্রের বর্ণনা সে স্থলে বড় সুন্দর, কিন্তু সঞ্জয়ভারতে এই প্রসঙ্গ এবং অন্যান্য সুন্দর আখ্যানের একেবারে উদয় হয় নাই।"

ভীষ্মের প্রতি শ্রীহরির কোপবিষয়ক এই আখ্যানটীও সঞ্জয়ভারতে (ঢা. বি, ৮৫৬ সং পুথি, ভীষ্মপর্ব্ব, ২৯ পত্রে), পরাগলী ভারতে (ঢা, বি. ২০২৪ সং পুথি, ১৯৪—৯৫ পত্রে) এবং বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতে (মুদ্রিত পুস্তক, ২য় খণ্ড, ৩২—৩৩ পৃষ্ঠায়) পাওয়া গিয়াছে। দীনেশবাবু সঞ্জয়ের কবিত্বের আদর্শস্বরূপ কর্ণ ও শল্যের উপাখ্যান উদ্ধৃত (ব' ভা. সা: ১৪০—৪২ পৃঃ) করিয়াছেন। এ উপাখ্যানটীও পরাগলী ভারতে (ঢা, বি, ২০২৪ সং পুথি, ৩৩৭ পত্রে), সঞ্জয়ী ভারতে (ঢা, বি, ৮৬৫ সং পুথি, কর্ণপর্ব্ব, ৪৭—৪৮ পত্রে), এবং বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতে (মুদিত ২য় খণ্ড, ২১৬—১৮ পৃঃ) পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং একে একে মিলাইয়া দেখা গেল যে, দীনেশবাবু যে সকল পদ্যাংশ সঞ্জয়ের নিজস্ব বলিয়াছেন, তাহা পরাগলীতে ও বিজয় পণ্ডিতের নামে প্রচারিত মহাভারতে পাওয়া যায়, এবং যে সকল পদ্যাংশ তিনি কবীন্দ্রের নিজস্ব বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও[১] সঞ্জয়ী ভারত ও বিজয় পণ্ডিতের নামে প্রচারিত মহাভারতে পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁহার উদ্ধৃত পদ্যাংশগুলির কোনওটীর দ্বারাই সঞ্জয়ী ভারত ও কবীন্দ্রভারতের বিভিন্নত্ব প্রতিপাদন সম্ভবপর হয় নাই।

ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বিজয়, সঞ্জয় ও কবীন্দ্রের মহাভারতে ছত্রে ছত্রে পদে পদে মিল লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আমিও পরাগলী মহাভারত, সঞ্জয়ী মহাভারত ও বিজয় পণ্ডিতের নামে মুদিত মহাভারত মিলাইয়া দেখিয়াছি। এত মিল দেখিয়াছি যে, এই তিনখানি গ্রন্থকে পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থ বলিতে কিছুতেই প্রবৃত্তি হয় না। এই মিল দেখাইবার জন্য আমি সঞ্জয়ী ভারতের পাঠ ও পরাগলীর পাঠ পাশাপাশি রাখিয়া কয়েকটী আখ্যান উদ্ধৃত করিলাম। এই আখ্যানগুলি মূল ব্যাস-মহাভারতের অন্তর্গত নহে। অথচ এইগুলির পাঠে উভয় গ্রন্থে কি সুন্দর মিল! প্রথম আখ্যানটী মহাভারতের উৎপত্তি বিষয়ে। ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির অবমাননা করায় তাঁহার অভিশাপে পরিক্ষিৎপুত্র জন্মেজয়ের কুষ্ঠব্যাধি হয়। পরে ব্যাসশিষ্য জৈমিনির নিকট মহাভারত শ্রবণ করিয়া তিনি ব্যাধিমুক্ত হন। দ্বিতীয় আখ্যানটী শকুন্তলার অঙ্গুরীবিষয়ে। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা নর্ত্তকীর বেশে প্রচ্ছন্নভাবে রাজা দুষ্মন্তের নিকট গিয়া নৃত্যগীত দ্বারা রাজাকে সন্তুষ্ট করে। রাজা তাহাদিগকে শকুন্তলার নিকট প্রাপ্ত রত্নহার উপহার দিলে তাহারা বলে যে, সে হার তাহাদেরই। তাহাদের নৃত্যগীতে সন্তুষ্ট হইয়া বরুণপত্নী তাহাদিগকে সেই হার দিয়াছিলেন। বরুণও তাহাদিগকে একটী অঙ্গুরী দিয়াছিলেন। দুষ্মন্তের রাজধানীতে তাহাদের হার ও অঙ্গুরী অপহৃত হইয়াছিল। যখন হার পাওয়া গেল, তখন অঙ্গুরীও রাজাকে সন্ধান করিয়া দিতে হইবে। দুষ্মন্তকর্তৃক নিযুক্ত চরগণ অঙ্গুরী সহ এক সুবর্ণবণিককে ধরিয়া আনিলে ছদ্মবেশিনী অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার অনুরোধে রাজা সেই অঙ্গুরী হস্তে ধারণ করিতেই তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ হয়, এবং তিনি শকুন্তলার শোকে অভিভূত হন।

১। কেবল গঙ্গাদাস সেনের নাচাড়িটী ছাড়া।

তৃতীয় আখ্যানটী জাহ্নবীর বানর পতি বা শান্তনুর পূর্ব্বজন্ম বিষয়ে। অভিশাপবশতঃ বানরকুলে জাত এক স্বর্গবাসী শিবকে স্তবে তুষ্ট করিয়া তাঁহার বরে গঙ্গাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হয়। গঙ্গা বানরের শরীরে লোম দেখিয়া লোম নাশের জন্য তাহাকে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করাইয়া মারিয়া ফেলেন। বানরজন্মের পর এই স্বর্গবাসী মহাপুরুষের শান্তনুরূপে হস্তিনাপুরের রাজকুলে জন্ম হয়। তিনি দ্বাদশ বৎসর গঙ্গাকে পত্নীরূপে ভোগ করেন। চতুর্থ আখ্যানটী বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুবিষয়ে। এই উপাখ্যানে সঞ্জয়ী ভারতে একটী নূতন কথার অবতারণা হইয়াছে। অন্য কোনও মহাভারতে এই আখ্যানটী পাওয়া যায় না। মৈথিলী ভারতে আবার চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুবিষয়ে অন্যপ্রকার কথা লিখিত হইয়াছে। পঞ্চম আখ্যানটী সভাপর্ব্বে অর্জ্জুন ও হনুমানের প্রসঙ্গ। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণ যে ভক্তের অধীন, তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমার উদ্ধৃত আখ্যানটীতে সঞ্জয়ী ভারতে অনেক বেশী কথা পাওয়া যাইতেছে। সমস্ত লঙ্কাকাণ্ডের কথাটী সংক্ষেপে এই প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কোনও গায়ন গান জমাইবার জন্য এই প্রসঙ্গটী জুড়িয়া দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কারণ, সঞ্জয়ী ভারতের আর একখানি পুথিতে (ঢা, বি, ৯৬৭ সং পুথিতে) এই প্রসঙ্গটী পরাগলী ভারতের ন্যায়ই সংক্ষিপ্ত আকারে পাওয়া যাইতেছে। ষষ্ঠ আখ্যানটী ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ বিষয়ে। দীনেশবাবু এই প্রসঙ্গটী তাঁহার সঞ্জয়ী ভারতে পান নাই। সপ্তম আখ্যানটি কর্ণপর্ব্বে কর্ণ ও শল্যের উক্তপ্রত্যুক্তি। দীনেশবাবু এই আখ্যানটী পরাগলীভারতে পান নাই। এইরূপ আরও অনেক আখ্যান উদ্ধৃত করা যাইতে পারিত। কিন্তু প্রবন্ধবাহুল্যভয়ে বিরত হইলাম।

১। মহাভারতের উৎপত্তিকথা

জন্মেজয়সমীপে ব্যাসদেবের উক্তি

সঞ্জয়ী মহাভারত (১৫৫০ সংখ্যক পুথি)	পরাগলী মহাভারত (২০২৪ সংখ্যক পুথি)
কালি তোমার দ্বারেত আসিব এক রথ।	কালি তোর দ্বারেত আসিব এক রথ।
ভুবনবিজই রথ দেখিতে মহত্য ॥	অতি বিলৈক্ষ্যন রথ নাহি ভুবনেত ॥
কদাচিত্য আরহন না করিয় তাত।	সেই রথ আরুহন না করিবা তাত।
আপন কুসল জদি চাহ নরনাথ ॥	আপনা কুসল জদি চাহ নরনাথ ॥
রাজা বোলে সৈত্য তোমার বচন পালিব।	
আচোক আরুহিব রথ পর্স না করিব ॥	
মুনি বোলে ই বাক্যে বিস্ময়ে লাগে মনে।	
তাকে পাইয়া উপেক্ষিব কাহার পরানে ॥	
নিশ্চয়ে চড়িবা রথে আমি জানি তত্যে।	জদি আরহন কর সুন মহাসয়ে।
তিন্ন দিগে ভ্রমিয় রাজা না জাইয় দক্ষিনেতে ॥	মৃগয়ারে না জাইবা দক্ষিন দিগএ ॥

রাজা বোলে তোমা বাক্য ধরিবাম চিত্তে।
আচৌক মৃগয়া কার্জ্য না চড়িব রথে ॥
মুনি বোলে বের্থ কেনে আমা বাড় কেনে।
আমি জানি মৃগয়াতে জাইবা দক্ষিনে ॥
তথা গিয়া এক পুবি দেখিবা বিদিত।
তার মধ্যে প্রভেস না করিবা কদাচিত্য ॥
বচন লঙ্গিয়া জদি জাও সেই পুরি।
তাব মধ্যে এক নারী দেখিবা সুন্দবি ॥
আপনাব হিত জদি চাও মহাসএ।
সেই কর্ন্যা না আনিবা সুন জন্মজয় ॥
জদি বা আনহ কৈন্যা কামবসে ধরি।
জজ্ঞপত্নি না করিবা মুক্ষ পাটেস্ববি ॥
এত বোল অন্তধ্যান হৈল তপুধন।
সুনিয়া হইল রাজা চিন্তাকুল মন ॥
মুনিয়ে অসর্ক্য কথা কহিল আমাতে।
ই সকল কথা আমি বোঝিব কেমতে ॥

দির্ব্ব পুবি দেখিবা জে মনোহব ভেস।
মনিমএ দেখিবা জে পুবিব উল্লাস ॥
কৈন্যা এক দেখিবা তাহাতে বিদ্ধমান।
সেই কৈন্যা না চাহিবা সুনহ বাজন ॥
সে কৈন্যা না নিবা ঘবে সুন জর্ম্মজএ।
পাটেশ্বরি না কবিবা সুন মহাশএ ॥
এ বোলিয়া ব্যাস মুনি গেল তপোবনে।
বিস্বএ হইয়া বাজা ভাবে মনে মনে ॥
মুনিববে এহি কথা কহিল আস্কাত।
কেমতে বুঝিব আম্মি এহাব সন্মত ॥

*　　*　　*

হেন কালে এক রথ আসিলেক দ্বাবে।
দ্বারি গিয়া জানাইল বাজাব গোচরে।
মুনি মুক্তা লাগি আছে বিচিত্র নির্ম্মান।
ত্রিভুবনবিজই আসিছে রথখান ॥
কুড়ি সহস্র রথ আছে তোমাব ভাণ্ডাবে।
হেন রথ নাই দেখি তাব সমর্স্ববে ॥
রাজা বোলে আন দেখি রথবব আগে।
কাব রথ কে আনিছে সুনি ধন্দ লাগে ॥
দ্বারি গিয়া সেই রথ আনিল বিদিত।
দেখিয়া নৃপতি হৈল পরম বিস্মিত ॥
বোঝিল্লা সকল কথা কহিয়াছে মুনি।
এমত অপুর্ব্ব রথ না দেখিছি আমি ॥
জর্ম্মান্তরের পুর্ন্ন ফলে বিধার্ত্তা নির্ব্বন্দে।
রাজা বোলে রথখান রাখ পুরিমধ্যে ॥

হেন কালে বথখান মিলিল দ্বাবেত।
দ্বাবি গিয়া জানাইল রাজাব অগ্রেত ॥
মনি মুক্তা লাগি আছে বহুল নির্ম্মান।
ত্রিভুবন বিদিতে আসিছে রথখান ॥
রাজাএ বোলে বথখান আনহ গোচরে।
কাহার জে বথখান জানিবাব তরে ॥
দ্বারি গিয়া রথখান আনিল ত্বরিত।
দেখিয়া নৃপতি মন হইল বিস্মিত ॥
বুঝিল শ্বরূপ কথা কহিআছে মুনি।
এমত অপুর্ব্ব কথা কভো নাহি সুনি ॥
এমত অপুর্ব্ব কথা নাহি দেখি সুনি।
মির্থা না হইল তবে ব্যাসের জে বানি ॥

দিনান্তবে বথে চডি বাজা জন্মজয় ।
মৃগয়া কবিতে গেল দক্ষিণ দিগএ ॥
ভ্রমিয়া সকল বন চাইল বিসেস ।
কুন্থানে না পাইল মৃগেব উদ্দেস ॥
পুনি বনান্তবে গেল নৃপতিসেখব ।
তথাতে দেখিল বাজা বর্ম্য সবোবব ॥
তাহাব উগ্যানে পুবি দেখিল বিদিত ।
মনিব বচন স্মবি বিস্ময়ে লাগে চিত্য ॥
মুনিয়ে নিসেদ আমা কবিআছে পূতে ।
দেখিলে অপুর্ব্ব পুবি তথা না জাইতে ॥
অতি বিলক্ষন পুবি অপুর্ব্ব নির্ম্মান ।
কৈন্না পাইলে উপেক্ষিমু দেখি পুবিখান ॥
ই বোলিয়া পুবিমধ্যে প্রভেসিল ঝাটে ।
দেখিল সুন্দব কৈন্না স্থভর্ন্নেব খাটে ॥
পবিধান পট্টসাবি গজমতি গলে ।
কুমাবিব বোপে গোনে পুবিখান জলে ॥
পাসে গিয়া জিজ্ঞাসিল নৃপতিকুমাবে ।
কাব কৈন্যা কেবা তুমি কহিবা আমাবে ॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া কৈন্যা দাণ্ডাইল আগে ।
আপনাব জত কথা কহিবাব লাগে ॥
বাপ মোব অংসুমান ক্ষেত্রিবংসে জাত ।
তাহান দুহিতা আমি কহিল তোমাত ॥
বিধার্ত্তা নির্ব্বন্দে জান তাব হৈল অন্ত ।
কহিতে আমাব কথা বডই দুবন্ত ॥
একদিন মহামুনি বালিখিলা নাম ।
অতিথি হইয়া গেল রাম অনুঠাম ॥

প্রদিপের শিক্ষা জেন মহাতেজসালি ।
অতি সহস্র সসি সম হস্তেব অঙ্গোলি ॥

কর্ম্মগতি ফলে কিবা বিধার্ত্তা নিবন্ধে ।
জত্ন কবি তাহাবে বাখিল পুরিমৈদ্ধে ॥
অপব দিবসে রাজা চড়িয়া রথএ ।
মৃগয়া কবিতে গেল দক্ষিণ দিগএ ॥
ভ্রমিয়া সকল বন চাহিল বিসেস ।
কোনখানে না পাইল মৃগেব উদ্ধেস ॥
আচম্বিতে পুবিখান দেখিল নৃপতি ।
মুনিবাক্য স্ববিয়া বিস্ব্এ হৈল মতি ॥
মনিএ নিসেদ পুনি কবিয়াছে পুর্ব্বে ।
পুবিমধ্যে প্রবেস জে না করিব তবে ॥
অতি বিলৈক্ষন পুবি দেবের নির্ম্মান ।
কৈন্যা পাইলে না আনিব দেখি পুরিখান ॥
এ বলিযা পুবি মৈদ্ধে প্রবেশিল ঝাটে ।
দেখিলেক কৈন্যাবত্ন বসি আছে খাটে ॥
পবিধান পট্টবস্ত্র বত্নহাব গলে ।
দেখিয়া কৈন্যাব রূপ মহিত সকলে ॥
জে হৌক সে হৌক কন্যা নিবাম ভুবন ।
দেখিয়া কৈন্যার রূপ মুহিলেক মন ॥
কাছে গিয়া জিজ্ঞাসিল নৃপতিকুমাব ।
আপনে কে তুহ্মি কৈন্যা কহ সমাচাব ॥
কাহাব দুহিতা তুহ্মি হও কাব নাবি ।
অঘোব কানন বনে আইলে একশ্বরি ॥
সম্বিত পাইযা কৈন্যা দাড়াইল আগে ।
পবিচয় দিয়া কথা কহিবার লাগে ॥
পিতা মোব অংশুমান ক্ষেত্রিবংসে জাত ।
কান্তাবতি নাম মোব কহিলুম তোহ্মাত ॥
বিধার্ত্তা নিবন্দ মোর পুরি হৈল অস্ত ।
কহিতে বিস্তর হএ সে সব বৃর্ত্তান্ত ॥
একদিন মহামুনি বালক্ষির্ল্য নামে ।
অতিথি হইয়া আইল বাপের আশ্রমে ॥
প্রদিপের শিক্ষা প্রায় তপে মহাবলি ।
অতি ক্ষুদ্র মুনি জেন বিদ্ধ অঙ্গুলি ॥

অথিতি দেখিয়া বাপে না কবিল পূজা।
অবজ্ঞা করিয়া বাপৈ না করিল পুজা।
ক্রোধ করি মুনিবরে দিল ব্রহ্মস্থাপ।
পুরিসমে ভস্ম হইয়া মৈল মুব বাপ ॥
পুষ্প আনিতে আমি ছিল পুষ্পবনে।
অভ্যাহতি পাইল আমি সেই সে কাবণে ॥
একাকিনি নারি আমি বান্দববর্জ্জিত।
নাইক দুসর জন আমার পুবিত ॥
বাজা বোলে কামবানে দহে মুব প্রান।
প্রান রাখ দিয়া মুরে আলিঙ্গন দান ॥
পরিক্ষিতসুত আমি নাম জর্ম্মজয।
চন্দ্রবংসে জর্ম্ম মুর জগতে জানএ ॥
সর্ম্মতি জানিয়া জদি না দেও উর্ত্তর।
দিবাম পুরুসবধ তোমার উপব ॥
তবে সেই কৈন্যা বোলে ববিবাবে পাবি।
জত্তপত্নি আমা জদি কব পাটেস্সর্বি ॥
তবে বাজাএ বোলে তোমাব হৈল নিজদাস।
জেই ইচ্ছা সেই তোমাব পুবাইব আস ॥
ই বোলিয়া কৈন্যা ধরি তুলিল বথএ।
গন্ধর্ব্ব বিভাহ করি চলিল দেসএ ॥
কৈন্যা পাইয়া জায়ে বাজা পবম হবিসে।

গুয়াইল অনেক দিন নানা বঙ্গবসে ॥
কুমাবিয়ে রাত্রিদিন কবহে ভকতি।
সকলেব মুর্ক্ষ্য তানে করিল নৃপতি ॥
বিধার্ত্তা নির্ব্বন্দ কেবা খণ্ডাইতে পাবে।
বিনি ভুগ না হইলে নহে অবসর্সরে ॥
পিত্রিস্রার্দ্ধ করিয়া বসিছে জর্ম্মজয়।
বাম পাসে মহাদেবি বসিয়া আছএ ॥
হেনকালে স্ত্রিঙ্গস্হঙ্গ বিভাণ্ডকসুত।
দক্ষিনা লহিতে আইল রাজার আগুত ॥
দণ্ড কমণ্ডল হাতে ভেস দিগাম্বর।

ব্রহ্মার তনয় জানি না করিল সৈজ্জা।
অবজ্ঞাএ বাপে তাবে না কবিল পূজা ॥
ক্রোধ হৈয়া মহামনি দিল ব্রহ্মশাঁপ।
পুরিমৈর্দ্ধে ভর্স্ব হৈয়া মৈল মোব বাপ ॥
পুর্প্প আনিবাব আহ্মি গেলাম পুর্প্পবনে।
অব্যাহতি পাই আহ্মি এহি সে কাবণে ॥
অকুমাবি নাবি আহ্মি বান্দববজ্জিত।
নাইক দ্বিতিয জন আহ্মাব সহিত ॥
বাজাযে বোলে কামবানে দহে মোব মন।
প্রান বাখ দিআ মোবে আলিঙ্গন দান ॥
পবিক্ষিতসুত আহ্মি নাম জর্ম্মজএ।
চন্দ্রবংসি বাজা আহ্মি কহিলুম নিশ্চাএ ॥
সম্ভ্রম কবিয়া জদি না দেয উর্ত্তব।
দিবম পুরুসবধ তোহ্মাব উপব ॥
কৈন্যাএ বোলে তবে সে ববিতে আহ্মি পাবি।
সমাহিতে কব জদি মুক্ষ্য পাটের্শ্ববি ॥
বাজাএ বোলে তোমাব স্থানে কৈল প্রানপন।
না কব অন্যথা পুনি জে লএ তোহ্মাব মন ॥
তবে পুর্প্পমালা লইয়া কৈন্যাএ বরিল।
হেনমতে অবণ্যেত বিবাহ নির্ব্বহিল ॥
সেই ক্ষ্যনে কৈন্যা পুনি তুলহিয়া রথএ।
কবিয়া গন্ধর্ব্ব বিহা আনিল দেসএ ॥
তবে জর্ম্মজয বাজা আনন্দিতে আইসে।
হেনমতে কত দিন গেল ক্রিড়াবসে ॥
কুমারিএ অর্নেক দিন মহাবাজা সেবি।
সকলেব মুখ্যা হয়া হৈল পাটেশ্বরি ॥
বিধার্ত্তাব নিবন্দ জে খণ্ডাইব কেবা।
বিনি ভোগ ভুঞ্জিলে জে কর্ম্মে আছে জেবা ॥
পিতৃশ্রার্দ্ধ কবিয়া বসিছে জম্মজয়ে।
বাম পাসে মহাদেবি বসিয়া আছয়ে ॥
হেনকালে হৃশ্রুশ্রীঙ্গ মুনি তপোধন।
দক্ষিণা লইতে আইল রাজার সদন ॥

দুইখান স্বঙ্গ মুনিব মাথাব উপব ॥
তাহা দেখি মহাদেবি হাসিল কটাক্ষে।
কবো নাই দেখি স্বঙ্গ মুনিব মস্তকে ॥

ধ্যান মনে মহামুনি মনে মনে ভাবি।
মুনিযে হাসিল জানি সেই মহাদেবি ॥
স্বঙ্গ দেখি আমাবে হাসিল দুষ্ট নাবি।
মুনিয় হাসিল তাব পুর্ব্বকথা স্মঁবি ॥
তাহা দেখি জর্ম্মজয় অগ্নিহেন জলে।
ক্রোধ কবি তখনে মুনিব প্রতি বোলে ॥
মুনি হৈয়া কামাতুর লর্জ্জা নাই মনে।
মহাদেবি দেখি মুড হাস কি কাবনে ॥
জ্ঞান নাই অকাবনে ব্রহ্মদণ্ড ধব।
তবে কেনে বনে গিযা মুনিভুর্ত্তি কব ॥
ই বোলিয়া সুবর্ন্নেব গাঙ্গ লৈয়া হাতে।
মুনি প্রতি মেলিযা হানিল কুপচিত্যে ॥
তাহা দেখি বিস্মস্বঙ্গ জ্বলে অগ্নিখণ্ড।
কি জানিযা মুডমতি নৃবে কৈলে দণ্ড ॥
ব্রহ্মবধ কবিযা তিলেক নাই ভয়।
হেন পাপ বাজা নাই পাণ্ডবকুলয় ॥
পবিক্ষিত নৃপতি আছিল তব বাপ।
অস্তিক মুনির গলে বান্দে মবা স্যাপ ॥
তাব পুত্রে স্যাপ দিল মনে কষ্ট কবি।
সপ্তদিন ভিতবে তক্ষকে খাইল মাবি ॥
শ্রীমর্ত্যে মর্ত্যতা হৈয়া আমা না গনছ।
তিলেকের মধ্যে তরে করিতে পাবি ভস্ম ॥
প্রানে না মারিব তবে সুন পাপমতি।
দণ্ডের উচিত সাস্তি দিবাম সমপ্রতি ॥
বন হতে বেস্‌সা আনি কর রতিক্রিড়া।
সর্ব্বাঙ্গ ভবিয়া তোমার হউক ব্যাদি পিড়া ॥
স্বঙ্গমুনিব বার্ক্য বের্থ নহে তিন লুকে।
কুষ্ট পিড়া রাজার জে হইল তিলেকে ॥

দণ্ড কমণ্ডুর্ল্ব হাতে মুর্ত্তি দিগাম্বর।
দুই খান শ্রীঙ্গ মুনিব মস্তক উপব ॥
তাহা দেখি মহাদেবি হাসিল কটাক্ষে।
কথা নহি দেখি শ্রীঙ্গ মুনির মস্তকে ॥
ধ্যানে জানিল মুনি মনে মনে ভাবি।
মুনিক হাসিল পাছে চাহি মহাদেবি ॥
আস্কাব দেখিয়া শ্রীঙ্গ কৈলা উপহাস।
বিধাতা নিবন্দ তোব মতি হৈল নাস ॥
তাহা দেখি জর্ম্মজয় অগ্নিহেন জলে।
ক্রোধে অগ্নিবত হৈয়া মুনি প্রতি বলে ॥
মুনি হৈযা কামভাব লজ্জা নাই মন।
মহাদেবি দেখিয়া হাসিলে কি কাবন ॥
জ্ঞান নাই অকারনে ব্রহ্মদণ্ড ধব।
কোন কায্যে তুম্মি সবে মৈনব্রত কর ॥
বাজার মহেসি হৈলে প্রজার জননি।
হেনজন দেখি হাস মেজ্যাদা না জানি ॥
এ বলিয়া জলপানেব গাড়ু লইল হাতে।
মুনি প্রতি মেলহিয়া মাবিল নবনাথে ॥
কপালে ফুটিল গাড়ু বক্ত পড়ে ধাবে।
চাপিয়া ধবিল মুনি তত্তিক্ষ্যনে করে ॥
ক্রোধ হইয়া মহামুনি জলে খণ্ড খণ্ড।
কি বুঝিযা মুঢমতি আস্কা কর দণ্ড ॥
ব্রহ্মবধ কবিতে তিলেক নাই ভএ।
তোব সম মঢ নাই ই তিন ভুবনএ।
পবিক্ষিত নৃপতি আছিল তোব বাপ।
অস্তিক মুনির গলে বান্দি মৃতা সাপ ॥
তার পুত্রে সাঁপিলেক মনে ক্রোধ করি।
সপ্তদিন ভিতরে তক্ষ্যকে গেল মারি ॥
স্ত্রিমদে মর্ত্ত হইয়া আম্মা না চিনস।
পুরিসমে সাঁপিয়া করিতে পারি ভর্স্ব ॥
প্রানে তোরে না মারিব সুন পাপমতি।
দণ্ডের উচিত ফল তোরে দিব সাস্তি ॥

ক্রোধ হনে ধর্ম্মজ্ঞান বোদ্ধি হয়ে নাস।
হিংসা হনে অধুগতি নরকেত বাস॥
ক্ষেমা সৈত্য দড় করি থাকে জার মনে।
তাহার আপদ নাই এ তিন ভুবনে॥
এতেক জানিয়া সবে পরিহর ক্রোধ।
ক্রোধ হতে কার্জ বাদ ধর্ম্মেত বিরোদ॥

লংঘিয়া ব্যাসের বাক্য ফলিল প্রমাদ।
আকাস ভাঙ্গিয়া জেন পডিল মাথাত॥
কাতর হইয়া কহে মুনির চরনে।
স্যাপের স্যাপান্ত মুক্ত কহ তপুধনে॥
মুনি বোলে অন্দ হৈয়া আছিলে তখন।
অখনে দেখয় চর্ক্ষে পাইয়া অঞ্জন॥
কর্ম্মগতি পাইলা স্যাপ নাইক খণ্ডন।
ব্যাসদেব হতে সুন বংসের কথন॥
তবে সে বিপদ হতে হইবা মুচন।
খণ্ডাইব আপদ তর ব্যাস তপুধন॥
ই বোলিয়া স্রিস্যস্হঙ্গ গেল নিজ স্তান।
চিন্তায়ে আকুল রাজা স্তির নহে প্রান॥
স্রীভ্রষ্ট হৈয়া রাজা বোদ্ধি হৈল নাস।
ভুমিতে বসিয়া রাজা ছাড়ন্ত নিস্‌সাস॥
বার্ত্তা পাইয়া ব্যাসদেব আসিল সত্ত্বর।
জথা আছে জর্ম্মজয় হস্তিনানগর॥
প্রনাম করিল রাজা মুনির চরনে।
ব্যাসে বোলে জর্ম্মজয় কহিছি তখনে॥

বনমৈর্দ্ধে বেশ্যা পাইয়া তুহ্মি কর ক্রিড়া।
সর্ব্বাঙ্গ বেড়িয়া তোর হউক কুষ্ট পিডা॥
হ্রশ্ব মুনির সাঁপ ব্রেথ নহে তিন লোক।
পিডা হৈল জন্মজয় দেখে সর্ব্ব লোক॥
অচ্ছিদ্র হৈল পিডা ছিদ্র নাই আর।
শ্রীঙ্গমুনির পাএ পড়ি করে হাহাকার॥
ক্রোধ হতে অধগতি নরকেত বাস।
মহামুনি ব্যাসদেবে কহে ইতিহাস॥
ক্রোধকালে লঘু গুরু না করে প্রকাস।
ক্রোধকালে মহাজনের বুদ্ধি হএ নাস॥
সৈত্য ক্ষেমা দুই কর্ম্ম থাকে জার সনে।
অপায় নাহিক তার এ তিন ভুবনে॥
এতেক জানিয়া মনে ক্ষেমা দেয় ক্রোদ্ধ।
ক্রোধ হতে কার্য্য নষ্ট ধার্ম্মেত বিরোধ॥
লংঘিয়া মুনির বাক্য ফলাইল কাজ।
আকাস ভাঙ্গিয়া জেন মুণ্ডে পড়ে বাজ॥
আপনা নাসের হেতু করিল প্রকাস।
না সুনি মুনির বাক্য কৈল সর্ব্বনাস॥
অপরাদ কৈলম মুনি তোমার চরনে।
সাপের সাপান্ত মাগিএ তোহ্মার স্থানে॥
মুনি বোলে অন্দ হৈয়া আছ কত কাল।
অখনে দেখহ চক্ষু পাইয়া জঞ্জাল॥
কর্ম্মগতি ফলে কায়া তোর কর্ম্মদোসে।
খণ্ডিব সকল তোর ব্যাস উপদেসে॥
এ বলিয়া শ্রীঙ্গমুনি গেল নিজ ঘরে।
ব্যাকুল হইয়া রাজা চিন্তএ অন্তরে॥
শ্রী ভ্রষ্ট হৈয়া রাজা বুদ্ধি হৈল নাস।
ভুমিতে বসিল রাজা হইয়া হতাস॥
বার্ত্তা পাইয়া ব্যাস মুনি আইল সত্ত্বর।
জথাএ আছে জর্ম্মজএ হস্তিনানগর॥
অভ্যান্তরে গিয়া রাজা দেখিলেক ব্যাসে।
জর্ম্মজএ দেখিয়া কটাক্ষে মুনি হাসে॥

পুর্ব্বে তোমা নিসেদিল করিয়া জন্মন।
মর্ত্য হৈয়া না রাখিলা আমার বচন ॥
তাখা সব বলবন্ত ছিল ধনুর্দ্ধব।
কেমতে বোঝাইব আমি সতেক বর্ব্বর ॥
রাখিতে না পাবি আমি এতেক বোঝাইযা।
প্রমাদ করিছ মুর বচন লংঘিযা ॥
মুনিতে কহিল রাজা করিয়া ভকতি।
তোমি বিনে ত্রিভুবনে নাই অভ্যাহতি ॥
জযমুনি দিলাম রাজা তোমা বিদ্যমান।
কহিব সকল কথা করিয়া বাখান ॥
ই বোলিযা অন্তর্ধান হৈল মহামুনি।
জর্ম্মজয় বোলে কথা সুন নৃপমনি ॥ *

(১৫৫০ সংখ্যক পুথি, ২ ক—১ খ পৃষ্ঠা)

দণ্ডবত হৈয়া রাজা পড়িল চরনে।
মুনি বোলে জর্ম্মজয় কি হৈব অখনে ॥
পুর্ব্বে নিসেদিল তোকে না সুন বচন।
মর্ত্ত হইয়া না সুনিলে অভাগ্য কারন ॥
তাহা সব বলবন্ত সুয্যের অধিক।
ইন্দ্রেরে জিনিতে পারে কি বলিব ধিক ॥
সেই সব বলবন্ত আছিল দুর্ব্বার।
বুঝাইতে পাবে কেবা সতত বর্ব্বর ॥
রাখিতে নারিল তোকে এতেক বুঝাইয়া।
মনির সহিতে বাদ কর কি লাগিয়া ॥
রাজাএ বোলে তুহ্মি পবে আর নাহি গতি।
আজ্ঞা কর কেমতে পাইব অভ্যাহতি ॥
মুনি বোলে সুন তোর বংসের কথন।
খণ্ডিব সকল ব্যাধি পাপ বিমোচন ॥
জয়মুনি নামে সিস্য তোহ্মা বির্দ্যমান।
তাহা হোতে সুন গিযা হইয়া সাবধান ॥
মনির মুখের কথা অমৃতের সার।
পদে পদে তাহার ধর্ম্মের অবতার ॥
সুনিলে সম্পাদ হযে পরলোকে তরি।
বিজএ পাণ্ডবকথা অমৃতলহরি ॥
সঞ্জযের মুখে তবে অমৃতের সর্ব্ব।
ব্যাস মুনির বাক্যে হৈল অষ্টাদশ পর্ব্ব ॥

(২০২৪ সংখ্যক পুথি, ২ ক—৫ খ পৃষ্ঠা)।

২। শকুন্তলার অঙ্গুরি

সঞ্জয়ী—

এথা সকুন্তলা এড়ি মুনিসিস্য গেল।
কন্দ মুনি আগে গিয়া সকল কহিল ॥
সুনিয়া কান্দিল মুনি বড় পাইয়া তাপ।
রাক্ষস অদিক হৈলাম মুহি তুর বাপ ॥
স্যামান্ন্য জনের মত দিল পাটাইয়া।
এতেকে ছাড়িল কিবা অপজ্ঞা করিয়া ॥

পরাগলী—

ওথা সকুন্তলা এড়ি সিস্যসব গেল।
মুনির অগ্রেতে গিযা সকল কহিল ॥
সুনিয়া সিস্যের মুখে কান্দিল বিস্তর।
নয়ানের জল তবে বহে ঝর ঝর ॥
সামান্য জনের মত দিল পাঠাইয়া।
এতেক ছাড়িল কৈন্যা অবজ্ঞা পাইয়া ॥

* ইহার পরবর্ত্তী পুষ্পিকার অংশটি সঞ্জয়ের পুথিতে নাই ; কেবল পরাগলীতে আছে।

ব্রহ্মস্যাপ করি কিছো না করিল ভয়।
ধর্ম্মেত বিমন হৈল হিলিন তনএ॥
অনুসুয়া পৃয়ম্বদা আনি পুছে মুনি।
কিরূপ প্রসঙ্গ ছিল তাহা কহ সুনি॥
আদি অন্ত তাহার কহিল দুইজনে।
পাসরিলা রাজায়ে ব্রহ্মস্যাপের কারনে॥
রাজায়ে অঙ্গোরি এক দিল বির্দ্ধমানে।
সে অঙ্গোরি সকুন্তলা রাখিছে জতনে॥
স্যাপের মুচন তবে দিলেক ব্রাহ্মন।
অঙ্গোরি দেখিলে রাজা স্মরিব তখন॥
মুনি বোলে বৃত্তান্ত জে তুমি জান তার।
দুই সখি গিয়া কর তার পৃতিকার॥
তারাহ মানিল তবে মুনির বচন।
রাজপন্তে হাটিয়া চলিল দুইজন॥
আপনার সিস্যসব সঙ্গে দিল মুনি।
নগরেত প্রভেসিয়া বঞ্চিল রজনি॥
প্রভাতেত সে দুই সৌরিন্দ্রিভেস ধরি।
প্রভেস করিল গিয়া রাজঅন্তপ্পুরি॥
দেখিয়া সকল লুক হৈল চমৎকার।
এই সকুন্তলা কিবা আইল পুনর্ব্বার॥
পুরবাসি নারিলুকে রাজাতে কহিল।
দেবকৈন্যা হেন দুই কথা হতে আইল॥
রাজার আজ্ঞায়ে নারিসকলে আনিল।
সৌরিন্দ্রি বলিয়া তারা পরিচয় দিল॥
একদৃষ্টে চাহে রাজা সখি দুই জনে।
লক্ষিতে না পারে দেখিআছে কুন্ স্তানে॥
স্নেহভাবে পুর্ব্বে রাজার মনে মনে জপে।
স্মরন করিতে নারে বোলে ব্রহ্মস্যাপে॥
রাজা বোলে সৌরিন্দ্রি থাকহ মুর পুরে।
ইচ্ছাচারি হৈয়া থাক সেবিয়া আমারে॥
এই মতে পুরিতে রহিল দুইজন।
ফিচারিয় সকুন্তলা না পাইল ভ্রমন॥

অনুসুয়া পৃয়ম্বদা আনি পুছে মুনি।
পুর্ব্বের রহস্য কথা কহ চাহি সুনি॥
মুনিত কহিল বার্ত্তা তারা দুইজন।
পাসরিল রাজাএ ব্রহ্মসাপের কারন॥
রাজার অঙ্গুরি এক অবির্জ্জান ছিল।
সকুন্তলাএ সেই অঙ্গুরি হস্তেত ধরিল॥
সাঁপের সাপান্ত তবে কহিল ব্রাহ্মন।
তাহারে দেখাইলে হৈব রাজার স্মোরন॥
মুনি বোলে তুহ্মি দুই জানহ সকল।
জেনমতে হএ ভাল চিন্তহ কুসল॥
তারা দুই মানিলেক মুনির বচন।
সরিন্দ্রির রূপ ধরি সখি দুইজন॥
সেই নগরে গিয়া বঞ্চিল রজনি।
ঘরে ঘরে সুনে নারি পুরানকাহিনি॥
রাজার নগরে তবে গেল দুইজন।
নানা নির্ত্ত দেখাইল চাহিল জনে জন॥
পাত্র মিত্র বাড়িতে করিল নানা নির্ত্ত।
অবিরোধে সকলের হরিলেক চির্ত্ত॥
রাজাতে বলিল গিয়া সব বিবরণ।
বিদেসি নির্ত্তকি আইল স্নন রাজন॥
রাজাএ বোলে আন নির্ত্ত চাহিব সকলে।
রাত্রিকালে চাহিবম হইয়া কুতুহলে॥
আজ্ঞা পাইয়া দুই জন তথাতে আনিল।
রজনিতে রাজপুরে বহু নির্ত্ত কৈল॥
রাজাএ দেখিল সেই লক্ষ্যি মুর্ত্তিমান।
ব্রাহ্মনের সাঁপে কিছু স্থির নহে জ্ঞান॥
স্থির করিবারে নারে মনে মনে জপে।
না পারে চিনিতে তারে ভ্রমে ব্রহ্মসাঁপে॥
তুষ্ট হই নৃপতি গলার দিল হার।
হার পাই দুইজন হরিষ অপার॥
সেই বস্তু পাইয়া তারা হাসিল কিঞ্চিত।
জোড় হাতে বলিলেক রাজার বিদিত॥

গুপ্তভাবে পুরিতে জিজ্ঞাসে অবিপ্রাএ।
এথা নাই সকুন্তলা তাগিয়া বা[জা]এ॥

অবিজ্ঞানে না বঞ্চিল কেবা নিল হবি।
লর্জ্জাযে বিকল কথা লুকাইল সুন্দবি॥
অবিপ্রায়ে জানে সকুন্তলা নাই এথা।
নাছে গায়ে দুইজনে স্মবি পুর্ব্বকথা॥
পুববাসি লুক সবে দেখন্ত কৌতুক।
স্ত্রি সবে জানাইল বাজাব সমুখ॥
তুষ্ট হৈয়া নৃপতি গলাব দিলা হাড।
চিনিয়া লহিল হাতে বহস্য সুন তাব॥
সকুন্তলা প্রতি পুর্ব্বে দিল ঔব্ব মুনি।
অঙ্গোরির পরিবর্ত্তে আনে নৃপমনি॥
জাতিএ সৌরিণ্ড্রি আমি নাছি গিত গাই।
কাহাব অদিন নহি ইর্ছাবে বেডাই॥
কৌতুকে নাচিতে গেল বরুণেব পুবি।
জত্ন কবি আমাবে বাখিল তাব নাবি॥
মনি এক দিল সেই বড় জত্ন করি।
আপোনে বরুন দিল হস্তেব অঙ্গোবি॥
তথা থাকি তোমাব স্থনিল সুচবিত।
কৌতুকে নাচিতে আইলাম তোমাব পুবিত॥
পথক্রমে নগবেত কবিল্ল সয়ন।
তঙ্কবে হরিল মুব হস্তেব বত্নন॥
সেই হতে বেড়াই আমি হইয়া বিসাদ।
প্লাইলাম হাড়মনি তোমাব প্রসাদ॥
জথাতে পাইল হাড় তথাতে অঙ্গোবি।
তুমা স্তানে পাইবাব অনুমান করি॥
অঙ্গোরি পাইলে আমি দেসে চলি জাই।
জথা তথা থাকিয়া তোমার গুন গাই॥
স্থনিয়া ই সব কথা বাজা চমৎকার।
কথাতে পাইল মনি নারে চিনিবার॥

অবধান কর বাজা কবি নিবেদন।
তোহ্মাব নগবে হাবাইল এক ধন॥
নির্ত্ত কবিবাবে গেল বরুণেব পুরি।
আপনে বরুনে দিল হাতের অঙ্কুরি॥
হাব অঙ্কুবি দুই পাইল তথাত।
তাহাব বির্ত্তান্ত এবে স্থন নবনাথ॥
পথশ্রমে নগবেত কবিলুম সয়ণ।
তস্করে হবিল মোর গাঠিব রর্ত্তন॥
হাব এক পাইলাম তোমাব প্রসাদ।
অঙ্কুবিব লাগি বাজা পড়িল প্রমাদ॥
একত্রে হাবাইল দুই স্থন নবনাথ।
হাব জাহাতে আছে অঙ্কুবি তাহাত॥
স্থনিযা বাজাএ তবে হইল লজ্জিত।
পবিনামে কিবা জানি হইব কুৎসীত।
এমত জানিয়া রাজা তাকে না বলিল।
কোতযাল আনি বাজা নির্জ্জনে বলিল॥
নগবেব মৈর্দ্ধে বত্ন অঙ্কুবি হবিয়া।
নিলেক কেমন জনে তস্কবি কবিয়া॥
সিগ্রগতি ধবি আন চোব জথা পাও।
নহে প্থনি অপজস হইব এথাও॥
বাজাব আদেস পাইয়া সব চবগন।
অন্তে অন্তে নগবেত কবএ ভ্রমণ॥
কেহ নির্ত্তকিব ভেষ ভিক্ষুকভেস ধরি।
অধম উর্ত্তম জনেব প্রবেসিল পুরি॥
এহি মতে বিচাব কবএ স্থানে স্থান।
বিধিএ পাবএ তাহা করিতে সন্ধান॥
জতেক ধিববগনে জলেত প্রবেসে।
জল মৈর্দ্ধে মৈৎস এক বাজিল [illegible]॥
কাটিলেক সেই মৈৎস অংস করিবার।
পাইল অঙ্কুরি এক নির্ম্মান সোনার॥
কেহ বোলে হাতে দিব [illegible]।
[illegible] মাঝে ভালা সোভা [illegible]॥

কেবা আনি দিল মুরে মনিরত্নহাড়।
অঙ্গোরি না দিলে হয়ে বহুল ধিকার॥
ভাণ্ডারির তরে রাজা বোলে ডাক দিয়া।
আনহ অঙ্গোরি ভাল বহুমুল্ল চাইয়া॥
ভাণ্ডারি আনিয়া দিল অঙ্গোরি অপার।
রাজা বোলে নেহ চিনি জে হয়ে তোমার॥
কৈর্ন্না বোলে ইয়ার নাইক প্রয়ুজন।
মির্থ্যা কথা কৈয়া কেনে নিব পরার ধন॥

কেহ বোলে কাচের হাতেত ভাল্লা সাজে।
কেহ বোলে হার গাথিয়া দিব ভুজে॥
কেহ বোলে ভাল সোভা করে শ্রুতিমুলে।
যমনি তুসীতে পারি আর এক পাইলে॥
এহিমতে সবে মিলি করএ ঝঙ্কার।
ঝালোয়া মণ্ডলে বোলে করিব বিচার॥
সবদাবে বোলে তবে মনেত ভাবিয়া।
আহ্মি জেবা কহি সুন সবে মন দিয়া॥
অল্প বস্তু লাগিয়া বিবোধ না করিব।
সুঁড়ির ঘরেত নিয়া সবে মদ খাইব॥
এহিমতে সকলে তথাতে চলি জাএ।
স্থাপ রাখি অঙ্গুরি সকলে মৈস্থ খাএ॥

সে অঙ্গোরিরত্ন অন্দকারে প্রকাসন্ত।
ভ্রম জার থাকে মনে দেখিলে স্মরন্ত॥
একত্রে হারাইলু দুই সুন নরনাথ।
হাড় জেই দিয়াআছে অঙ্গোরি তথাত॥
সুনিয়া রাজার মনে বিস্ময়ে হইল।
কথাতে পাইল মনি কেবা আনি দিল॥
কেবা হরি নিল মনি নাইক নির্ন্নএ।
না পাইলে অপজস সংসারেত রএ॥
মনে চিন্তিলেক রাজা তাক আস্সাসিয়া।
কহিলেক পাত্র মিত্র প্রজারে ডাকিয়া॥
অন্তপ্পুরি হনে মুর অঙ্গোরি হরিয়া।
নিলেক কেমন চোরে পুরি প্রভেসিয়া॥
জত্ন করি ধরি আন দুষ্ট জথা পাও।
না পুনি সঙ্কট হৈব সিগ্র চলি জাও॥
রাজার আদেস পাইয়া কতয়ালগন।
অনুচর স্থানে স্থানে কৈল নিজ্জজন॥
নুর্ত্তকি হইল কেহ ভিক্ষুকভেস ধরি।
কেহ দ্বিজ ভট্ট হয়ে হস্তে পুথি করি॥
দু সাধুর স্ত্রি সবে পসার মাথে করি।
উত্তাম অদম কুকেক্ষ ফিরে বাড়ি বাড়ি॥

দৈবগতি সরুবরে জালসা সকলে।
বিদিয়ে ঘটাইল তারে পরম জঞ্জালে॥
জালমধ্যে এক মৎস বাঝিল বিসেসে।
বড় মৎস দেখি সব হরিস বিসেসে॥
কাটিলেক মৎস তারা অংস কবিবার।
পাইল অঙ্গোরি তাথে নির্ম্মিত স্থনার॥
কেহ বোলে হস্তে দিব আমার রমনি।
পিত্যলের মধ্যে স্থভে ভাল বাঙ্গাখানি॥
কেহ বোলে হাড় গাথি দিব বামভুজে।
দেখি তুষ্ট হইবেক রমনিসমাঝে॥
কেহ বোলে ভাল স্থভা করে স্রোতিমুলে।
রমনি তুসিতে পারি আর এক পাইলে॥
এইমতে কন্দল হইল অনিবার।
জালুয়ামণ্ডলে বোলে করিল বিচার॥
অল্প বস্তো লাগিয়া বিরূদে কাজ নাই।
স্থণ্ডিঘরে বেচি চল সবে মধ্য খাই॥
এই জুক্তি করি সবে নগরেত গেল।
অঙ্গোরি থুছিয়া গুপ্য সবে মধ্য খাইল॥
না নিল অঙ্গোরি আ[র] কৈবর্ত্ত গুয়ার।
স্থণ্ডিয়ে নগরে নিল মুল্য দেখাইবার॥
স্থনারোবর্ন্নিকে কিছো ধন দিয়া নিল।
আপনা পাল্লিত নিয়া জত্ন করি দিল॥
গৃহকর্ম্ম করি সেই বন্নিকের নারি।
ক্ষেনে ক্ষেনে ঘরে গিয়া চাহে সে অঙ্গোরি॥
খেলা হেতু সিসু দেখি কান্দিতে লাগিল।
সিসুহাতে বস্ত্র দিয়া নিবারন কৈল॥
চপল অজ্ঞান সিসু বোদ্ধি নাই তাত।
খেলা হেতু লড় দিয়া গেল আঙ্গিনাত॥
পাছেত জননি তার ধাএ ত্রস্ত হৈয়া।
বালকের হস্ত হনে আনিল কাড়িয়া॥
হু সাহু ভ্রমিতে আসি দেখে অকস্মাত।
অমনি বালক সঙ্গে রাখে আঙ্গিনাত॥

নানা কথা কহে তবে ধিবর গোঁয়ার।
স্থাঁড়এ নিলেক তবে মুল্য দেখাইবার॥
সোনার বনিক্যে পাইয়া কিছু দিয়া লইল।
আপনার গৃহে নিয়া জর্ত্তনে রাখিল॥
গৃহকর্ম্ম করি তবে বনিক্যের নারি।
ক্ষেনে ক্ষেনে ঘরে গিয়া দেখে সেই অঙ্কুরি॥
সেই সে জে অঙ্কুরি তিমির প্রকাসন্ত।
ভ্রম জার থাকে সেই দেখিলে স্বোবস্ত॥
বালকের গলাতে বান্দিয়া দিল তারে।
তাহারে পাইয়া সিসু লাগে খেলাইবারে॥
চপল চঞ্চল সিসু নাছি হিত তাত।
খেলা হেতু লড় দিয়া গেল আঙ্গিনাত॥
পিছে পিছে জননি ধাইল ততৈক্ষণ।
বালকের গলে থুইল করিয়া জর্ত্তন॥

রাজ্জ অবরন বস্ত্র জুগ্য নহে তুর।
চোর বোলি বান্দিলেক বনিক্য নগর॥
বানিয়া নগরে হৈল মহা কুলাহল।
বন্দি করি লৈয়া চলে বর্ন্নিক সকল॥
বিষম সঙ্কট বড় দেখি সেই কাজ।
বর্ন্নিক্যে বান্দিয়া আনে সুণ্ডির সমাজ॥
বান্দিল ভিবর সব সুড়ি উপদেসে।
কতআলে দণ্ডঘাত করিল বিসেসে॥
বন্দি করি লৈয়া জায়ে রাজার গোচর।
বসি আছে নবপতি জেন পুবন্দর॥
হেনকালে হুসাহু করিল নিবেদন।
আজ্ঞা কর কি সাস্তি করিব চোরগন॥
রাজা বোলে দক্ষিন সাগরে নিয়া মার।
সৈরিন্দ্রিরে আনি দেও অঙ্গোরি তাহার॥
জুড়হস্তে বোলে তবে জাল্য়ামণ্ডলে।
হুস গুন নাই জানি ভুগি কর্ম্মফলে॥
ধর্ম্ম সঙ্কোচিতে দেখি তোমার বিচার।
ধর্ম্মেহ না পারে এই কর্ম্ম খণ্ডাইবার॥
হাসিয়া হুস্মান্তে বোলে না মারিব তুকে।
কথাতে অঙ্গোরি পাইলা সৈত্য কহ মুখে॥
কহিল সকল কথা জালুয়া প্রধান।
সৌরিন্দ্রিকে অঙ্গোরি দিলেক বিগ্যমান॥
সৌরিন্দ্রিয়ে বোলে পাইল আপনার ধন।
তাহার বিচার আর কুন প্রয়ুজন॥
জদি জানিবারে রাজা চাহ তার গুন।
হস্তেত লহিয়া বোজ জদি লহে মন॥
হাসিয়া অঙ্গোরি দিল নৃপতির হাতে।
সকুন্তলা বৃর্ত্তান্ত রাজা স্মরিল মনেতে॥

১৫৫০ সং পুথি, ১৮—২০ পত্র।

দো সাধু ভ্রমিতে তাহা দেখি অকস্মাত।
কাড়িয়া লইল তবে সে অঙ্কুরি হাত॥
অঙ্কুরি পাইয়া তবে হরসিত হৈল।
চোর বলি সুবর্ণবনিক্য বন্দি কৈল॥
বনিক্যের সমাজে বিসম হৈল কাজ।
বনিক্যে বান্দিল গিয়া সুঁড়িব সমাজ॥
বান্দিল ধিবর সব সুড়ি উপদেসে।
দণ্ডেকে ভাড়িল কোতআলের নিদেসে॥
বন্দি করি লই গেল রাজার গোচর।
রাজা বসী আছে জেন পুর্ন্ন সসোদর॥
কোতয়ালে বোলে রাজা কিবা হৈল ফল।
চোর সব আনিয়াছি তোমার গোচর॥
রাজাএ বোলে দক্ষিন সমদ্রে নিয়া মার।
সরিন্দ্রিরে বস্ত্র আনি দেয়ত তৎকাল॥
হস্ত জোড় করি বোলে জতেক মণ্ডল।
কিবা করিতাছি পাইতে তার ফল॥
হাসিয়া সরিন্দ্রি বোলে সুনহ রাজন।
তাহার বিচার করি কোন প্রওজন॥
জদি জানিবার চাহ এহার জে মর্ম্ম।
পরসিলে হুর হয়ে সতেক অধর্ম্ম॥
জানিবার চাহ জদি এহার জে গুন।
তবে জানিবা রাজা মহিমা নিপুন॥
হাসিযা অঙ্কুরি রাজা লইলেক হাতে।
সকুন্তলার বিবরন স্বরিল মনেতে॥

২০২৪ সং পুথি, ৩৮—৪০ পত্র।

৩। জাহ্নবীর বানরপতি

সঞ্জয়ে,—

সেবকবৎস্মল হর ত্রিদেসইস্বর।
তুষ্ট হৈয়া কহে তোমি মাগি লহ বর॥
বড তুষ্ট হৈল আমি তুমা ভক্তি দেখি।
মনের অবিষ্ট বর লহ তোমি মাগি॥
আর্দ্য অন্ত কহি আমি নাইক সংসএ।
জেই চাহ সেই দিব কহিল নিশ্চর্এ॥
সুনিয়া সিবের আজ্ঞা কপি মহাহরি।
অতি ভয়ে কহিলেক পুটাঞ্জোমি করি॥
সুনিতে অসঙ্গা কথা কহিতে কুশ্চিত।
অসঙ্গত কথা কৈতে মনে লাগে ভিত॥
সঙ্করে বোলেন তোমি ভয় পরিহর।
সেই চাহ সেই দিব সৈর্ত্য কৈল ধর (—দঢ)॥
পাইয়া অভয়ে বর কহে কপিপতি।
সুরেশরি গঙ্গাবে অবিষ্ট (—অভীষ্ট) মুব মতি॥
সঙ্করে বোলেন কপি আজি জাহ ঘরে।
প্রভাতে আসিয় কালি এই গঙ্গাতিরে॥
সানন্দিত হৈয়া বানর গেল তথা হতে।
অপর দিবসে আসি মিলিল প্রভাতে॥
বৃসেত চড়িয়া তবে পঞ্চবক্ত্র সিব।
গঙ্গা গৌরা সঙ্গে করি আইল জগজ্জিব॥
জলেত লামিল সিব দুই ভার্জ্জা লহিয়া।
পাছেত রহিল কপি সম্ভ্রমিত হৈয়া॥
পবন স্মরিয়া তবে আজ্ঞা দিল হর।
জাহ্নভির উরু হতে বস্ত্র কর হুর॥
হরের আজ্ঞায়ে বায়ু কুণ্ডল আকারে।
গঙ্গার স্মরির হতে বস্ত্র হুরে করে॥
পৃষ্টে থাকি তাহারে দেখিল কপিরাজ।
বিবসন হৈল গঙ্গা বড় পাইল লাজ॥

পরাগলীতে,—

সেবকবৎসল হর ত্রিলৈক্ষ ইশ্বর।
তুষ্ট হইযা বোলে হর মাগী লও বর॥
বড় তুষ্ট হৈল আহ্মি তোহ্মা ভক্তি লাগি।
মনের অবিষ্ট বর ঝাটে লও মাগি॥
সৈত্য পুর্ব্ব বলি আহ্মি নাহিক সংসএ।
জেই চাহ সেই দিব কহিল নির্চ্চএ॥
সুনিয়া সিবের কথা কপি নাম হরি।
অতিভয় কহিলেক হস্ত জোড় করি॥
আপনেহে তুষ্ট হৈয়া দিতে চাহ বর।
মনের অবিষ্ট কহিতে বাসী ডর॥
অতিসয় সুখ মোর মনের অবিষ্ট।
সুনিতে কুৎসীত বড় লোকেত গরিষ্ট॥
সুরেস্বরি গঙ্গাবে অবিষ্ট মোর মতি।
ভয় পরিহরি বর মাগে কপিপতি॥
মহাদেবে বোলে কপি চলি জাও ঘরে।
প্রভাতে আসীয় তুহ্মি এহি গঙ্গাতিরে॥
আনন্দিত মনে কপি গেল আশ্রমেতে।
মিলিলেক নদিতিরে রজনি প্রভাতে॥*
বৃসেতে চড়িয়া তবে দেব পঞ্চসির।
সুরেস্বরি গঙ্গা লইয়া গেল নদিতির॥
জলেত লামিল হর গঙ্গা গৈরা লইয়া।
পিষ্টভাগে রহে কপি সম্ভ্রম করিয়া॥
পবন স্বরিয়া তবে আজ্ঞা দিল হর।
জাহ্নবির অঙ্গ হতে বস্ত্র হুর কর॥
হরের আর্জ্জাএ বাউ কুণ্ডল আকারে।
গঙ্গার জে অঙ্গ হতে বস্ত্র হুর করে॥
বিবসন হই গঙ্গা বড় পাইল লর্জ্জা।
পিষ্টভাগে সঙ্করে দেখিল কপিরাজা॥

কষ্টমনে গঙ্গারে স্থাপিল পঞ্চসির ।
বানরে দেখিল তর গোপ্ত জে স্মরির ॥
আমার পাসেত থাকি কুম্ভ কার্জ্জা নাই ।
আজ্ঞা কৈলু জাও তোমি বানরার ঠাই ॥
পুনি পুনি আজ্ঞা কৈল দেব ত্রিলুচন ।
কর জুড়ে কহে গঙ্গা বিনয়ে বচন ॥
এই অপরাদে গোসাই মুরে স্থাপ দিলে ।
স্থাপের স্থাপান্ত মুক্ত হৈব কত কালে ॥
কৃপা মনে সাপান্ত উপাএ সাৰ্ক্ষ্যাতে দিল হব ।
বানর সেবিয়া থাক দ্বাদস বৎস্মর ॥
সাপান্ত জে হুর হৈব দ্বাদস বৎস্মবে ।
হুর্ক্ষ না ভাবিহ গঙ্গা চলিহ সর্তাবে ॥
অমুগা তোমার নাম হইব মৈর্তোতে ।
পাইবা স্থাপের ফল না হুসিবা তাথে ॥
আর এক বাক্য গঙ্গা পালিয জর্ত্যনে ।
অষ্টবসু স্থাপিআছে বসিষ্ঠ ব্রাহ্মনে ॥
বসিষ্টের কামধেনু উৰ্ব্বসিবে দিল ।
অষ্ট গর্ব্বপাত হৈতে বসিষ্টে সাপিল ॥
অষ্ট বসু হইলেক ত্রিসিব সাপান্ত ।
কৃপামনে মহামুনি দিলেন্ত উপান্ত ॥
হরস্থাপে গঙ্গা দেবি জাইব ভুবনেত ।
সেই গর্ব্বপাত হৈয়া আসিবা সর্গেত ॥
এই কহি গঙ্গাদেবি হরে বিসর্জ্জিল ।
গঙ্গা লেহ বলিয়া বানরে আজ্ঞা দিল ॥
আগে জাএ গঙ্গাদেবি পাছে কপিস্মর্ব ।
কত হুরে গিয়া গঙ্গা দিলেক উর্ত্যর ॥
কপট করিয়া তাকে কবিব বিনাস ।
তবে সে জাইতে পারি হরের সম্পাস ॥
আদিপর্ব্ব মহাপুতা সুধারসমএ ।
পয়ার সুগম করি কহিল সঞ্জএ ॥
এত ভাবি গঙ্গা বোল্লে সুন কপিনাথ ।
মনের অবিষ্ট কেনে না কহ আমাত ॥

কষ্টমনে গঙ্গারে বলিল পঞ্চসির ।
বানরে দেখিল তোহ্মার গুপ্ত সরির ॥
আহ্মার পাসেত তোহ্মাব রহিতে কার্য্য নাই ।
আজ্ঞা দিল চল তুহ্মি বানরের ঠাই ॥
পুনি পুনি বোলে তবে দেব ত্রিলোচন ।
কব জোড়ে গঙ্গাএ তবে বলিল বচন ॥
এহি অপরাদে মোরে দেয এহি ফল ।
সাঁপেব সাঁপান্ত তবে হৈব কতকাল ॥
কৃপামনে প্রচ্যাতে সাপান্ত দিল হর ।
বানব সেবিযা বহ দ্বাদস বৎসর ॥
সাঁপেব সাঁপান্ত হইব দ্বাদস বরিসে ।
বিনয তেজিযা গঙ্গা চলহ হরিসে ॥
অমোঘা তোহ্মাব নাম হইল মৈর্ত্যলোকে ।
পাইলা দোসেব ফল না হুসীবা মোকে ॥
আব এক বাক্য গঙ্গা পালিবা জৰ্ত্তনে ।
অষ্টবসু সাঁপিয়াছে বসীষ্ট ব্রাহ্মনে ॥
বসীষ্টের ধেনু হরি উৰ্ব্বসিবে দিল ।
অষ্ট গর্ভে জৰ্ম্ম হৈতে বসীষ্টে সাঁপীল ॥
তবে অষ্টবসু হৈল বিসীব পাদান্ত ।
কৃপামনে মহামুনি দিলেক সাঁপান্ত ॥
হবসাঁপে গঙ্গা জাইব মৈর্ত্য ভুবনেত ।
তার গর্ভে জৰ্ম্ম লভি আসিবা স্বর্গেত ॥
এহি কথা কহি হর গঙ্গা বিসর্জ্জিল ।
গঙ্গা নেয বলিযা বানর সম্বোদিল ॥
আগে জাএ কপিরাজা পিছে সুরেস্বরি ।
কত দুর গিযা দেবি বুদ্ধি স্থির করি ॥
কুপটে (?) ইহারে করিতে পারি নায ।
তবে সে জাইতে পারি সঙ্করের পাস ॥
এত ভাবি গঙ্গাএ বোলে সুন কপীনাথ ।
মনের অবিষ্ট কেহ্নে না কহ আহ্মাত ॥
কিবা হেতু মোহোরে কথাত জাও লইয়া ।
কিবা আছে তোহ্মার মনে না দেয় কহিয়া ॥

কুন্ হেতু তোমি মোবে লৈই জাও মাগিয়া।
আপনা মনেব কথা কহত ভাঙ্গিয়া॥
হাসিয়া বানবে কহে সুন সুবেশ্ববি।
সঙ্কর সেবিয়া পাইছি তোমি হেন নাবি॥
এত সুনি কহে গঙ্গা পবিহবি লাজ।
হিত উপদেস কহি সুন কপিবাজ॥
তুমাব লুম্ভস তনু অঙ্গে না সহিব।
তুমাব সহিতে বোল কেমতে বঞ্চিব॥
সর্ব্ব লুম্ভ ত্যাগ কব আনলে পুবিয়া।
আমা সঙ্গে ক্রিড়া কব বচন পালিয়া॥
কামাতুব হৈছি বব সুনহ সুন্দবি।
তোমি জেই আজ্ঞা কব সেই কর্ম্ম কবি॥
গঙ্গা বোলে আমি বর দিলাম তুমাবে।
আনলের তেজে তোমা কি কবিতে পাবে॥
প্রথমে পবিক্ষা বোজ অঙ্গোলি দহিয়া।
পশ্চাতে সুন্দব হৈবা সর্ব্বাঙ্গ পুবিয়া॥

তবে অল্প অগ্নি কবি পবসিল কায়া।
অঙ্গোলি নিলুম্ভ হৈল গঙ্গা কৈল মায়া॥
গঙ্গায়ে করিল মায়া পর্ত্যযে বানব।
গঙ্গা বোলে মহাকুণ্ড এবে অগ্নি কব॥
খনিয়া গহন কুণ্ড আনল জালিল।
গঙ্গার বচনে কপি তথা ঝাম্প দিল॥
গঙ্গাবে আকাঙ্খি কপি মনে কাম্য কবি।
আনলে পুবিয়া মৈল কপিবাজ হবি॥
মৃত্তু হৈল কপিরাজ গঙ্গা সতন্তব।
চলি আইল গঙ্গা দেবি সঙ্কর গোচব॥
এথাএ দৈবঘটনে তাথে ফলিল অকাজ।
জেই কুণ্ডে মরিল বানর কপিরাজ॥
আনল সহিতে তথা উর্ত্থলিল জল।
মহাকুণ্ড উর্ত্থলিয়া করে টলমল॥

হাসীয়া বানবে বোলে সুন গঙ্গাদেবি।
তোহ্মাবে পাইল আহ্মি মহাদেব সেবি॥
তবে গঙ্গাদেবি বোলে পবিহবি লাজ।
এক নিবেদন মোব সুন কপিবাজ॥
আহ্মাব পবিত্র অঙ্গ তোহ্মাব লোমস।
তোহ্মাব আহ্মার অঙ্গ না হএ স্বপস॥
সর্ব্ব অঙ্গ দাহ কব আনল জালিয়া।
আহ্মা লই ঘর কর হবসীত হৈয়া॥
হবসীত হই বোলে কপীনাম হবি।
তোহ্মাব অবিষ্ট জেই সেইক্ষণ কবি॥
কিন্তু এক কথা মোব সুন সাবহিতে।
আনলেব মৈর্দ্ধে অঙ্গ দহিব কেমতে॥
গঙ্গাএ বোলে আহ্মি বব দিলাম তোহ্মাবে।
আনল পবসে তোহ্মা কি কবিতে পাবে॥
প্রথমে পবিক্ষ্যা কব কিছু পবসীয়া।
প্রচ্চ্যাতে নিল্লোম হইবা সমুলে মজ্জিয়া॥
তবে অল্প অগ্নি কবি পবসীল কায়া।
অঙ্গুলি নিল্লোম হৈল গঙ্গা কবে মায়া॥
পবিক্ষ্যা পাইয়া পের্ত্য হইল বানব।
গঙ্গাএ বোলে কুণ্ড কবি মহা অগ্নি কর॥
খনিয়া গহিন কুণ্ড মহা অগ্নি কৈল।
গঙ্গাব বচনে কপী জলে ঝাপ দিল॥
গঙ্গাএ স্রীজিল মায়া মনস্কাম্য কবি।
আনলে পুড়িয়া মৈল কপীবাজ হরি॥
মির্ত্তু হইল বানব জাহ্নবি সতন্ত্রব।
চলি গেল সুরেশ্বরি শঙ্কব গোচব॥
এথা দৈবফলে ঘটীলেক কাজ।
জেই কুণ্ডে ঝাপ দিয়া মৈল কপীরাজ॥
আনল সহিতে তথা উথলিল জল।
মহাকুণ্ড নিবাইল হৈল টলমল॥

সেই কুণ্ড উত্য'লিয়া ডুবাইল পাড়।
আনল সহিতে বহে তপ্ত জলধার ॥
সেইত দক্ষিন ভাগে বৈতরনি নাম।
তাহার দক্ষিনে পুরি জম অনুপাম ॥
তবে মৃত বানর বসিয়া সেই জলে।
অতি বড় সরির লাগিল দুই কুলে ॥
আটাসি সহস্র মুনি জায়ে তপ হুতে।
দেখিলেক অগ্নিময়ে জল বহে স্রোতে ॥
পরসিতে না পারে অর্ত্তন্ত তপ্ত জল।
কি হৈল কি হৈল করি ঘুসন্ত সকল ॥
প্রভাতে দেখিল এথা না আছিল পানি।
অগ্নিময়ে তাথে কেনে ভয়ে তরঙ্গিনি ॥
হেনকালে দেখিলেক মরা এক কপি।
বান্দিআছে জল সেই দুই কুল চাপি ॥
সেই বার্জো রাজা জে হস্তিনাপুরবাসি।
জজ্ঞ দান কৈল সেই পুত্র অবিলাসি ॥
সেই বানরে বর করি পার হৈল হেলে।
হইল আকাসবানি সুনিল সকলে ॥
উপকারি বানর জে না জাও ছাড়িয়া।
বেদমন্ত্রে জিয়াইল সকলে বেড়িয়া ॥
পরম সুন্দর হৈল দির্ব্ব কলেবর।
তারে দেখি মুনি সবে ভাবিল অন্তর ॥
কুরুর বংসেত জন্ম সিবি নৃপবর।
তাকে দিব এই পুত্র চলহ সর্ত্তর ॥
ই বোলিয়া আনি দিল রাজার গোচর।
অপুত্রা রাজারে দিয়া দিল পুত্রবর ॥

সান্তোনু ইয়ার নাম তাহার নিশ্চ'এ।
মুনির প্রভাবে রাজা পাইল তনএ ॥
মুনি সবের আসির্ব্বাদে [দে]বতার বরে।

জল উথলিয়া ডুবাইল চারি পার।
আনল সহিতে জল বহে তপ্তধার ॥
সেইত দক্ষিন নদি বৈতরনি নাম।
তাহার দক্ষিনে জম রাজার আশ্রম ॥
তবে মহাবানর ভাসিল মহাজলে।
অতি বড় সরির বাঝিল দুই কুলে ॥
আটাসী সহস্র মুনি জাএ তপপথে।
দেখিলেক অগ্নিময় জল বহে তাতে ॥
পরসীতে না পারে অত্যন্ত তপ্ত জল।
কি হৈল কি হৈল করি ঘোসএ সকল ॥
প্রভাতে দেখিল সবে না আছিল পাহ্নি।
অগ্নিময় জল বহে কি হেতু না জানি ॥
হেনকালে দেখিলেক মৃতা এক কপি।
রহিআছে নদির জে দুই কুল চাপী ॥
প্রতিস্রুবা নামে রাজা হস্তিনাতে বসী।
পুত্র অভিলাসে রাজা হৈল রাজরিসী ॥
পাত্র স্থানে রাযা দিযা সেই নরেস্বর।
মুনি স্থানে নৃপতি তপ করে বহুতর ॥
রাজাএ বোলে রিসী সব না ভাবিবা আর।
এহি বানরেত চড়ি নদি হও পার ॥
রাজার বচন সুনি সব মুনিবর।
বানরেত ভর করি তরিল দুস্তর ॥
একে একে পার হৈয়া গেল তপপথে।
হইল আকাসবানি তাহার অগ্রেতে ॥
উপকারি বানর জে না জাইহ এড়িয়া।
দেবমন্ত্রে বানরেরে দেয় জিয়াইয়া ॥
পরম সোন্দর বর হৈব নরেস্বর।
অপুত্রা নৃপতি পাইব এহি পুত্রবর ॥
সান্তনু এহার নাম হইল নিচ্চ্যএ।
তপের প্রভাবে রাজা পাইল তনএ ॥
হেন কালে আকাসেত দেববানি পুনি।
বানরের পুন শ্রীষ্টি করে মহামুনি ॥

হেন মতে সান্তনু আছয়ে রাজঘরে ॥
এথা গঙ্গা চলি গেল সঙ্করের পাস।
জানাইল বানরের হইল বিনাস ॥
মহাদেবে বোলে গঙ্গা বানর মারিয়া।
আমারে ভাড়য় গঙ্গা কপট করিয়া ॥
দেবতার কার্জ্জ্য হেতু পাটাইলু তুকে।
কপটে বানর মারি বাড় (= ভাঁড়হ) কেন মুকে ॥
চল চল গঙ্গা তোমি শান্তনুর ঘরে।

রাজপুত্র হইআছে বদিছ জাহারে ॥
লর্জ্জ্যা পাইয়া জার্হ্নবি জে চলে আরবার।
হস্তিনাপুরিতে গেল নৃপতির দ্বার ॥

এথা রাজা পুত্র পাইয়া আনন্দ অপার।
নৃর্ত্ত গিত কুতুহল না[না] ন প্রকার ॥
অস্ত্র সাস্ত্র ধনুর্বির্দ্ধা সকল সিখিল।
নানা দেসে জুর্দ্ধ করি সাসিয়া আনিল ॥
দেখিয়া নৃপতি তবে হরসিত হৈয়া।
জুবরাজ কৈল তানে পাত্রমিত্র লৈয়া ॥
হেনকালে গঙ্গাদেবি দিল দরসন।
সভাসদ পাত্রমিত্র আছে সর্ব্বজন ॥
একবস্ত্রে দাণ্ডাইল জার্হ্নবি রূপবতি।
সভাতে দাড়াইল কৈর্ন্ন্যা জেহেন পার্ব্বতি ॥
কৈর্ন্ন্যা দেখি রাজা তবে জিজ্ঞাসে কাহিনি।
দির্ব্ব কৈর্ন্না রূপবতি কাহার নন্দিনি ॥
গন্ধর্ব্বের কৈন্না কিবা হয়ত অপসরি।
কিবা দেবকৈর্ন্না হয় নও বিদ্যাধরি ॥
পরিচয়ে দেয় মুরে ভ্রম কি কারন।
কেবা তোমা মাতাপিতা এথা কি কারন ॥
কুন্ জাতি হয় তোমি দেয় পরিচএ।
দেবকৈর্ন্না হয় কিবা মনে মুর লএ ॥

ধরিল সান্তনু নাম রাজার তনয়।
পুত্র লইয়া গেল রাজা আপন ঘরএ ॥
মুনিলোক আসীর্ব্বাদ দেবলোকবরে।
হেন মতে সান্তনু হইল রাজঘরে ॥
ওথা গঙ্গা ছলি গেল সঙ্করের পাস।
কহিলেক জেইমতে বানর হৈল নাস ॥
মহাদেবে বোলে তুহ্মি বানর মারিয়া।
আহ্মারে ভাড়হ আসি কপট করিয়া ॥
দেবতার কার্য্য হেতু পাটাইল তোক।
কপটে বানর মারি ভাড আসী মোক ॥
হইছে সান্তনু নাম সেই কপিবর।
প্রতিশ্রুবা রাজপুত্র হস্তিনা নগর ॥
চল চল গঙ্গা তুহ্মি সান্তনুর ঘরে।
রাজপুত্র হইছে বধিলা বানরারে ॥
লর্জ্জা পাই জাহ্নবি চলিল আরবার।
হস্তিনা পুরিতে গেল রাজার দ্বার ॥
সভা করি বসিছে সান্তনু নরপতি।
এক পাস হই রহে জাহ্নবি যুবতি ॥
ত্রিলৈক্ষমুহিনি কৈন্যা আছে নিসবদে।
কথা হতে কথাএ জাইবা.বোলে সভাসদে ॥
উত্তর না দিল কৈন্যা সভার সাক্ষ্যাতে।
পুর্ব্বকথা কহি সুন সকল পণ্ডিতে ॥
সান্তনু রাজার পুত্র মির্তুএ অপ্ছর।
তান হেতু তপ করি পুজিল সঙ্কর ॥
মহাদেবে বর দিল সেই মোর পতি।
আজ্ঞা দেহ মোহোর হইব কোন গতি ॥
অমোঘা মোহোর নাম সান্তনুর নারি।
দেবকৈন্যা তোহ্মারে বরিল কাম্য করি ॥
সুনিয়া দেবের কথা সভা আনন্দিত।
পরম হরিস হৈল নৃপতির চির্ত্ত ॥
আদেসীল নৃপতি আনিতে যুবরাজ।
দেবকৈন্যা স্থিহা কর পরিহরি লাজ ॥

রাজা স্তানে কহে তবে দেবি সুরেস্বরি। ত্রিলৈক্ষমুহিনি কৈন্যা রূপেত অমুল্ল।
সর্ব্বকথা কহে কৈন্না মনে কাম্য করি ॥ বিসেস বাপের আজ্ঞা দেব সমতুল্হ ॥
বহু দিন কৈল আমি সিব আরাধন। বিবাহ হইতে তার হইল সন্মতি।
সাস্তোন্নু আমার পতি তোমার নন্দন ॥ লগ্ন করি বিবাহ করিল সিগ্রগতি ॥
অমুগা আমার নাম জর্ম্ম দেব জুতে। জাতি কুল ধর্ম্ম আমি কহিল তুমাতে ॥

১৫৫০ সং পুথি, ৪০—৪১ পত্র। ২০২৪ সংখ্যক পুথি, ৫৫—৫৭ পত্র।

৪। চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু

চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুবিষয়ক আখ্যানটী দুই গ্রন্থে দ্বিবিধ। উভয় গ্রন্থ হইতে আখ্যানটী উদ্ধৃত হইল।

পরাগলীতে ঃ—

বির্দ্ধ হৈল সান্তন্নু হইল পরলোক। সৈর্ত্যবতি সনে রাজা পাইলা বড় সোক ॥
করিলেক সতকার পিণ্ড প্রওজন। রাজা হৈল চিত্রাঙ্গদ সান্তন্নুনন্দন ॥
তির্থ করিবারে গেল ভিস্ম পিতৃকায্য। রাজা হৈল চিত্রাঙ্গদ পুজে সর্ব্বরায্য ॥
ভিস্মের বিক্রমে রাজা হৈল সত্রুহিন। চিত্রাঙ্গদ সুখে রায্য করে কত দিন ॥
দৈবজোগে চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের পতি। নাম স্থনি তথনে আইলা সিঘ্রগতি ॥
যুর্দ্ধ আহুতিল হিরণ্য নদিতিরে। চতুরঙ্গ বলে রাজা হৈল বাহিরে ॥
গন্দর্ব্বের সনে রন আছিল বিস্তর। পড়িল অনেক সৈন্ত গেল জমঘর ॥
সংপুর্ন্ন বিংসতি দিন আছিল সংগ্রাম। গন্দর্ব্বে মারিল রাজা চিত্রাঙ্গদ নাম ॥
হেন কালে তির্থ করি ভিস্ম আইল ঘরে। দেখিয়া গন্দর্ব্বপতি পলাইলা ডরে ॥

* * * * * *

তবে ভিস্মে রাজা কৈল বিচিত্রবির্জ্জক। আপনেহ সর্ব্বকর্ত্তা পৃথিবিপালক ॥

* * * * * *

জয়মুনি বোলেন্ত বিচিত্রবির্জ্জ রাজা। সর্ব্বক্ষন পালিলেক ভিস্ম মহাতেজা ॥
অভিনব জৌবনেত জৈক্ষ্যা রোগ হৈল। না হইতে অপৈর্ত্য বিচিত্রবির্জ্জ মৈল ॥

সঞ্জয়ে ঃ—

বৃর্দ্ধ হৈয়া নবপতি পাইল পরলুক। ভির্স্ম সনে সৈত্যবতি পাইল বড় সুক॥
কবিল খেত্রিয় কর্ম্ম পিণ্ডপ্রয়ুজন। রাজা হৈল চিত্রাঙ্গদ সান্তনুনন্দন॥

* * * * * *

অভিনব জোবনেত জর্ক্ষ্যা রোগ হৈল। সন্ততি না হৈতে সেই পরলুক হৈল॥
তবে ভিস্মে রাজা কৈল বিচিত্রবির্জ্জক। আপনেহৈ ভিস্ম বির সমাব পালক॥

* * * * * *

ভিস্মের প্রসাদে বৈরি নাইক ভুতলে। বিচিত্রবির্জ্জকে কহে ভিস্ম মহাবলে॥
তিন দিগে ভাই তোমি কবিয় গমন। কদাচিত্যে না করিবা দক্ষিনে ভ্রমন॥
বেহ্মপুরি নাম সেই জানাইল তথা। তথা গেলে মন দুর্ক্ষ পাইবা সর্ব্বথা॥
ই বোলিযা ভিস্ম বিব চলিল তির্থেতে। সংসারেত জত তির্থ ভ্রমে ক্রমাগতে॥
পিত্রিসর্গ হেতু গয়া গেলেন তুরিতে। একে একে পিণ্ডদান দিল বিদিমতে॥
এথাতে বিচিত্রবির্জ্জ তিন পত্নি সাতে। জর্ক্ষ গন্ধর্ব্ব কর লহে হস্তিনাতে॥
ত্রিভুবন বস করি দিছে ভিস্ম বিরে। সর্ব্ব রার্জ্জ্যে কর আনি ভেটয়ে তাহারে॥
আর দিন গেল রাজা দক্ষিন দিগএ। বেহ্মপুরি প্রবেসিল রাজা মহাসএ॥
দেখিল বিচিত্র পুরি ভুবনমুহন। রাজা বোলে এথাতে ভিস্মের নারিগন॥
দেখিব কেমত নারি পুরে প্রবেসিয়া। তবে কেনে মহাবিরে নাই করে বিহা॥
ই বোলিয়া চলে বির পুরে প্রবেসিতে। নানা ধাতু সুরম্য দেখয়ে পথে পথে॥
স্থানে স্থানে নানা পুষ্প রম্য সরুবর। চারি পাসে মলয়া জে মধ্যেত কমল॥
কুকিলে কবহে নাদ ভ্রমরের রূল। নানা পক্ষি কৃড়া করে বোলন্ত সুবোল॥
সেই পুরে প্রবেসিয়া দেখয়ে সুঠান। তার মধ্যে এক গৃহ বিচিত্র নির্ম্মান॥
তাথে এক পালঙ্গ জে সুর্দ্ধ সুভর্ন্নে রে। পঞ্চ সত পার্সে দির্ঘ দুই জে হাজারে॥
তাহার মধ্যেত জান সুবর্ন্ন উপাধান। দুই সত হাত দেখি তাহার প্রমান॥
বিচিত্র কনকঘণ্টা সর্জ্জার উপরে। মধুমাসে ভিস্ম বির থাকে সেই ঘরে॥
সেই খাটে ভিস্ম বির করহে সয়ন। ইন্দ্র ঐরাবতে আসি করহে তাড়ন॥
দস দণ্ড ভিস্মেরে তাড়য়ে করিবরে। তার পরে নিদ্রা জায়ে ভিস্ম মহাবিরে॥
ভিস্মের প্রতিজ্ঞা আছে গজের সহিতে। ঘণ্টা নাড়া দিলে আইসে জায়ে সেইমতে॥
সেই বস্থখাটে রাজা করহে সয়ন। কুতুহলে সেই ঘণ্টা নাড়য়ে তখন॥
নৃপতির নিদ্রা আইল বসন্তের বাএ। ভিস্ম জ্ঞানে সেই হস্তি আসিল তথাএ॥
ভিস্ম জ্ঞানে কৈল তারে বহুল তাড়ন। চোর্ন্নবত হৈয়া রাজা তেজিল জিবন॥

শ্রীযুক্ত রমানন্দ ঠাকুর-কৃত "সংক্ষিপ্ত মহাভারতসার" নামক মিথিলাভাষায় লিখিত গ্রন্থে আখ্যায়িকাটী অন্তবিধ।

"কালক্রমে রাজা চিত্রাঙ্গদ মহা দুরাচারী ভৈ গেলাহ ঔর যোজনগন্ধা রাজ্যক বিনাশক সম্ভাবনা দেখি স্বপুত্র ব্যাসজীক স্মরণ কৈলন্হি ঔর ব্যাসজী তৎক্ষণে আবি উপস্থিত ভেলাহ। যোজনগন্ধা হুনকা রাজা চিত্রাঙ্গদকেঁ উপদেশ করৈ কহলথিন্হ্। ব্যাসজী উত্তর দেহথীন্হ জে হে মায়! ও রাজ্যক মদসঁ অন্ধ ভৈ গেল ছথি ঔর হমর কথা নহি সুনতাহ, তেঁ হম অহাঁকেঁ উপদেশ সুনবৈছী ঔর অহাঁ হুনকা কহিঔন্হি। জখন ও একরা স্বীকার কৈলথিন্হ তখন সঁ নিত্য সন্ধ্যা কালসঁ অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত ব্যাসজী অপনা মায়কেঁ রাজনীতি বিষয়ক উপদেশ সুনাবৈ লগলাহ। নিতাকের ঈ ব্যবস্থা দেখি রাজাক মনমেঁ ব্যাসজী ঔর মাতাক প্রতি ব্যভিচারক ভ্রম ঔর অসন্তোষ ভেলৈন্হি ঔর মনমেঁ নিশ্চয় কৈলন্হি জে এহি দুরাচারী ব্রহ্মচারীক প্রাণান্ত করী। পরন্তু মনমেঁ বিচার কৈলন্হি জে বেত্রেক পূর্ণ রূপেঁ নিশ্চয় কৈনে ব্রহ্মহত্যা কখনো কর্ত্তব্য নহিথিক তেঁ জাচ করৈক হেতু একান্তমেঁ স্থিত ভৈ এক রাত্রি সুনলন্হি জে ব্যাস হুনকা মায় কহিক ঔর ও হুনকা পুত্র কহিক সম্বোধন করৈছথিন্হ্। তখন যথার্থ ধর্ম্মশালী রাজা চিত্রাঙ্গদকেঁ মিথ্যা আরোপ সঁ অত্যন্ত মনস্তাপ ভেলৈন্হি। ঔর প্রাতঃকালমেঁ ব্যাসজীকেঁ রজাক হাথ জোড়ি কৈ প্রায়শ্চিত্ত পুছলথিন্হ জে হে ঋষে! মিথ্যা আরোপ করবাক কী প্রায়শ্চিত্ত থিকৈক? ব্যাসজী কহলথীনহ জে হে রাজন্! পুরান পীপর ক গাছক ধোধরি মেঁ মিথ্যা আরোপী মনুষ্য প্রবিষ্ট ভৈ আগি লগা কৈ জীবিত হি প্রাণান্ত করৈ, যেহটা প্রায়শ্চিত্ত ছৈক। ঈ সুনি ও ধার্ম্মিক রাজা চিত্রাঙ্গদ সৈহ কৈলন্হি। ঔর তৎপশ্চাত ভীষ্মজী রাজ্যক অধিকার বিচিত্রবীর্য্যকেঁ দেলথিন্হ পরন্তু দৈবাৎ ও শিকারমেঁ সিংহ দ্বারা মারল গেলাহ।" ৯—১০ পৃষ্ঠা।

৫। অর্জ্জুন ও হনুমান

(সভাপর্ব্ব)

সঞ্জয়ে :—

কতদিন পরে গেল কদলির বনে।
জে বনে নিবাস করে বির হনুমানে॥
সৈন্ত কুলহল সুনি করে অনুমান।
মহাকায় সরির হইল বলবান॥

পরাগলীতে :—

জাইতে জাইতে গেল কদলিকাবনে।
হনুমান সনে হইল তথা দরস[নৈ]ন॥
সৈন্তের কল্লোল সনি বির হনুমান।
মহাকায় হইলেক পর্ব্বত সমান॥

সরির করিল তবে সম্‌রূ সমান।
সব্দ উগ্বেসিয়া রহে মনে করি জ্ঞান॥

লাঙ্গোড়ে পর্ব্বত নাড়ে বির হনুমান।
তাহা সুনি চমকিত হইল অর্জ্জোন॥

পথ বিরূদিয়া রহে পবননন্দন।
তাহা দেখি চমকিত যত সর্ন্নগণ॥

এতেক ভাবিয়া বিরে মনে সার কৈল।
সৈর্ন্ন সব সম্বদিয়া তখনে কহিল॥

সুন সুন রাজা সব আমার বচন।
কারন না বোজি হেন কিহেতু কারণ॥

দেবতা রার্ক্ষস কিবা গন্ধর্ব্ব কিন্নর হএ।
ইয়ার নির্ন্নয়ে জানি আসিবারে হএ॥

সর্ন্ন সমে থাক সমি সাবহিত হৈয়া।
জাবত আসিয়ে আমি তার বার্ত্তা লৈয়া॥

মহাবলি ধনঞ্জয়ে নিসঙ্কা রিদএ।
সব্দ উগ্বেসিয়া জাহে তাহার আলএ॥

হস্তেত বিসাল ধনু জেন পুরান্দর।
প্রভাতের সুর্জ্জ জেন করহে উর্জ্জল॥

দুরে থাকি চায়ে তারে পবনকুয়র।
নিসঙ্কা হইয়া বির আইসে একার্স্বর॥

তারে দেখি হনুমানে করে আলুকন।
দেখিয়ে পার্থের রূপ অতি বিলর্ক্ষণ॥

প্রসর্ন্ন সরির তার কান্তি কলেবর।
হস্তেত ধনুক করি আইসে ধনুর্দ্ধর॥

গগনে পরসে ধ্বজ মেরুস্হঙ্গ রেখা।
সঘন বিজুলি জেন গগনেত দেখা॥

হস্তেত কার্ম্মুক তার দির্ব্ব কলেবর।
কর্ন্নেত কুণ্ডল তার সুর্জ সমুর্স্বর॥

অর্ক্ষয় বানের টোন অরূন কিরন।
দারূকে চালায়ে রথ পবনগমন॥

ইন্দ্রপুত্র রথে আছে জেন ইন্দ্রতুর্ল্ল।
নরনারায়ন সে জে চাইতে অমুর্ল্ল॥

লেঙ্গুড় আস্ফালি উঠে বির হনুমান।
লেঙ্গুড়ের বিক্রমে ত্রিভুবন কম্পমান॥

সব্দ সুনি স্তব্ধ হইল বির ধনঞ্জয়।
বিপরিত সব্দ কেবা করে অবন্যয়ে॥

চিন্তিত হইল বির ভাবে মনে মন।
বহু বহু বির সবে কহিল বচন॥ -

তুহ্মি সব থাক এহি স্থানে সান্ত হইয়া।
জাবত আসিয়া আহ্মি অবনা বেড়াইয়া॥

মহাসব্দে ধনঞ্জয় বিসর্ন্ন হৃদয়ে।
একস্বর চলে বির সমরে নির্ভয়ে॥

জেই দিগে সুনিআছে সব্দ অনুসার।
সেই দিগে চলে বির বিক্রমে অপার॥

অন্তরে থাকীয়া দেখিল হনুমান।
ভএ না চিন্তিয়া বির করিল পয়ান॥

হাতে ধনুবান ধরি জাএ একস্বর।
দুরে থাকী দেখীলেক পবন কোঁয়র॥

অন্তরে থাকিয়া বির করে আলোকন।
দেখেন্ত পার্থের সঙ্গে বিযুলি লৈক্ষন॥

তেজস্মি সরির দেখে মহাকলেবর।
নিদাগেত দহে জেন দেব দিবাকর॥

গগনে পরসে ধ্বজ গিরিশ্রীঙ্গ দেখী।
সঘন পতকা উড়ে বিযুলির রেখী॥

হাতেত গাণ্ডিব সোভে দির্ব্ব সরাসন।
জেন হেন চন্দ্রধনু সোভএ গগন॥

অক্ষয় সানিতে বান অরূন কিরণ।
দারূকে চালাএ রথ পবনগমন।

ইন্দ্রসুত ধনঞ্জয় ইন্দ্রে অস্ত্র গম্য।
নরনারায়ন বির বোলে ধৈন্ত ধৈন্য॥

বোদ্ধিবিসারদ বির পবননন্দন।
মনে মনে ভাবে তবে কুন্ মহাজন॥
কিবা ইন্দ্র কিবা সুর্জ্জ্য কিবা নিসাকর।
নররূপে জর্ম্ম হরি মুনিস্তের ঘর॥
দড়ান না জাএ মন আইসে কুন্ জন।
মনে মনে ভাবে তবে না বোঝি কারন॥
কত ভবিস্মত দেখি নয়নগোচর।
ত্রেতা জোগে কৃষ্ণ জন্ম হইল দ্বাপর॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব জে ইন্দ্র অবতার।
কৃষ্ণ সমে সংসারেতে খণ্ডাইতে ভার॥
খাণ্ডবপ্রহস্তে রাজ্য করে পঞ্চ জন।
রাজস্মহি করিবারে করিছে গমন॥
পিত্রিকুল উর্দ্ধারিতে মনে করি সার।
ধনঞ্জয়ে বির আইসে ধন আনিবার॥
জদুসর্ন্য সঙ্গে তার কৃষ্ণ অনুমতি।
পাটাইয়া দিছে হেন লহে মুর মতি॥
নারায়ন মধ্যে হয়ে অর্জ্যোন দুর্ব্বার।
কৃষ্ণের দ্বিতিয় তনু বিদিত সংসার॥
বোজিবাম কেমত তাহার বেবহার।
এত বোলি রহে তথা পবনকুমার॥
অতি ক্ষিন তনু হৈয়া পবনতনয়।
হেনকালে তথা গেল বির ধনঞ্জয়॥
দেখিলেক একজন কপির আকৃতি।
রথ এড়ি তার কাছে জায়ে সিগ্রগতি॥
জুড়হস্ত করি বোলে পাণ্ডোর নন্দন।
নানারূপ ধর তোমি কুন্ মহাজন॥
কুন্ দেব হয় তোমি কাহার নন্দন।
পরিচয়ে দাও মুরে শুন মহাজন॥
হনুমানে কহে আমি জাতে পশু কপি।
বনমধ্যে নির্ভা করি বড় হৈয়া তাপি॥
তোমি কুনু মহাসএ নাইক নির্ন্নএ।
না কর বিস্ময়ে তোমি দেও পরিচএ॥

বুদ্ধির-সাগর বির পবননন্দন।
মনে মনে ভাবে এহি কোন মহাজন॥
কিবা ইন্দ্র কিবা চন্দ্র কিবা দিবাকর।
কিন্তু ভবিস্বত এক দেখিএ গোচর॥
শ্রুতি গেল দ্বাপর কৃষ্ণ রামবর।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব দেখীল সর্ত্যর॥
কৃষ্ণ সঙ্গে খণ্ডাইল পৃথিবির ভার।
পঞ্চ ভাই বসি আছে খাণ্ডব অধিকার।
রাজসুই জৈজ্ঞ করিবারে হইল মন।
ধনের কারনে চলিছে চারি জন॥
পিতৃকুল উদ্ধারিতে যজ্ঞের সম্ভার।
ধনঞ্জয় চলিয়াছে ধন হরিবার॥
যদুসৈন্য নারায়নি কৃষ্ণ অনুমতি।
রাখিবারে দিয়াআছে অর্জ্জুন সংহতি॥
নরনারায়ন বির অর্জ্জুন প্রধান॥
কৃষ্ণের দ্বিতীয় তনু করি অনুমান॥
জানিব তাহার আজি কোন ব্যবহার।
এত বোলি হনুমান হইয়া আগুসার॥
অতি খুদ্র মুত্তি ধরি বানর আকৃতি।
হেনকালে বলিল অর্জ্জুন মহামতি॥
দেখএ জে কপিরূপ বিড়াল সমান।
রথ হতে নামিলেক বিদিত তাহান॥
হস্ত জোড় করি বোলে তুমি মহাজন।
নানারূপ ধর তুহ্মি হও কোন জন॥
কোন দেব হও তুহ্মি কাহার নন্দন।
পরিচয় দেয় মোরে মাঞা ছাড়ি মন॥
হনুমানে বোলে তুহ্মি কোন জন হও।
না কর সম্ভ্রম মনে স্থির হইয়া কহ॥

হাসিয়া অর্জ্জ্যোনে কহে সুন মহাসএ।
কৃষ্ণের সেবক আমি নাম ধনঞ্জয় ॥
পাণ্ডববংসেত জর্ন্ম অর্জ্জ্যোন মুব নাম।
জুদিষ্টি অনুজ আমি করি জজ্ঞকাম ॥
ধনবস্ত্র বহুমুর্ল্ল বিচিত্র ভুসন।
তে কারনে করিআছি লঙ্কাতে গমন ॥
অর্জ্জ্যোনবচন সুনি কপি মনে হাস।
কেনেবা এমত কর্ম্মে তোমার অভিলাস ॥
কত কত কোটি কোটি প্রধান কপিবরে।
নানামতে বান্দিআছে গাছ জে পাথরে ॥
তবে নলনারায়নে কটক করি পার।
রাবন মারিয়া সিতা করিলা উদ্ধার ॥
এহেন সাগর তোমি স্বরে বন্দ করি।
ধন আনিবারে বোল গিয়া লঙ্কাপুরি ॥
তাজি আমি বোঝিবায় জত সক্তি তুর।
কুনমতে জাও তোমি তরিয়া সাগর ॥
এত বোলি কপিসুত মনেত ভাবিয়া।
অর্জ্জোনাকে কহে সে জে বহুল হাসিয়া ॥
কেবল বালক তোমি জানিল অখন।
কুন্ স্তানে কার মনে করিআছ বন ॥
কু কালে কুন্ত কর্ম্ম না করিছ তোমি।
তোমার চরিত্র জানি কহিআছি আমি ॥
কার্জ্য নাই প্রতিষ্টা করিতে করে ছার।
মুড় সবে জানে কাল ফুটিলে বিসাল ॥
গোনিন্দ জে সব হয়ে গোন করে গুপ।
তাহার প্রতিষ্ঠা জান ঘুসে সর্ব্বলুক ॥
কার্জ্য নাই সাদ্ধি আগে করিআছ পন।
এতেকে তুমারে বোলি বিমহিত জন ॥
সিসুবোদ্ধি বোলি তুরে না কহিল আর।
কার্জ্য সিদ্ধি করি কহ তবে জানি সার ॥
কম্ম নহি করি কর আপনা বাখান।
সে পুনি নারকে বলে পুরানপ্রমান ॥

হাসিয়া কহন্ত পার্থ সুন মহাসএ।
কৃষ্ণের প্রসাদে ত্রিভুবনে নাই ভএ ॥
পাণ্ডুবংসে জর্ম্ম মোর অর্জ্জুন মহাসএ।
যুধিষ্টিরঅনুজ মুই ইন্দ্রের তনয়ে ॥
বস্ত্রধন বহুমুল্য আনিতে কারন।
এহি হেতু লঙ্কা জাইতে করিছি গমন ॥
অর্জ্জুনবচনে কপি ইসিত হইল হাস।
অসম্ভব কার্জ্জেত তোহ্মার অভিলাস ॥
খর্ব্ব নিখর্ব্ব কোটি প্রধান বানর।
একমাসে পার হইল রাম নৃপবর ॥
তবে প্রভু লঙ্কা গেল সাগর হইল পার।
রাবন সংহার কৈল সিতার উদ্ধার ॥
হেন সিন্ধু বান্ধি বোল লঙ্কা জাইবার।
অহঙ্কার করি বোল ধন আনিবার ॥
তাজি বুঝিবার চাহি সক্তি বোল তোমার।
কেন মতে জাও তুহ্মি সাগর ভিতর ॥

পাণ্ডুবংসে জর্ম্ম তোমার নাই অনাচার।
ভাল না করিছ তেমি কবি অঙ্গিকার॥
তাহা সুনি ধনঞ্জয়ে ভাবি কৈল সার।
কপিরূপে ধর্ম্ম আসি হৈল অবতার॥
বোঝি তার বিচক্ষন নাইক অধর্ম্ম।
বোঝিতে না পারি আমি এই সব মর্ম্ম॥
এত সুনি অর্জ্জোনে জে জুড় করি হাত।
হনুমান স্থানে কহে বিনয়ে পশ্চাত॥
অর্জ্জোনে কহেন তোমি দেও পরিচয়ে।
সুনিয়া আমার মনের খণ্ডোক বিস্ময়ে॥
বহুত কহিল পার্থে বিনতি করিয়া।
হনুমানে পরিচয়ে দিলেক হাসিয়া॥
অঞ্জনা আমার মাতা কেসরি জনক।
পবন আমার পিতা ভুবনপালক॥
হনুমান নাম মর বিক্ষ্যাত ভুবন।
রামকার্জ্য হেতু মুর জন্ম কপিগন॥
পিতাসৈত্য হেতু রাম চলি আইল বন।
সুন্য গৃহ পাইয়া সিতা হরিল রাবন॥
তবে রামসনে হৈল সুগৃব দ্রসন।
বালি মারি রার্জ্য তবে দিল নারায়ন॥
লক্ষ্মনে বধিল বালি রাম অনুমতি।
প্রতিজ্ঞা করিয়া কহে সুর্জ্জোর সম্মতি॥
রাবন মারিয়া সিতা করিতে উদ্ধার।
কুন্ন কপি না পারে সাগর তরিবার॥
তবে জুক্তি করি কহে মন্ত্রি জাম্ববান।
অন্যের নাইক কার্জ্য আন হনুমান॥
তবে রঘুনাথে মুরে পূর্ব্বকার্জ্য বোলি।
সাগর তরিতে মুরে দিল বাহু তুলি॥
রামপদে আস করি সাগর তরিয়া।
অমুকবনেত সিতা নির্ম্ময়ে জানিয়া॥
তবে জানকির সনে করি দরসন।
আর পরে ভাঙ্গিলু রাজার মধুবন॥

পাণ্ডুবংসে জন্ম তোর রাজার কুমার।
অহঙ্কার করি বোল ধন আনিবার॥

অর্জ্জুনে বোলেন্ত আগে দেহ পরিচয়।
তবে সে আহ্মার মনে হওন্ত প্রত্যয়॥
বহুল করিল স্তুতি পার্থ মহাসয়ে।
তুষ্ট হৈল হনুমন্ত দিল পরিচয়ে॥
অঞ্জনা আহ্মার মাও কেসরি জনক।
পবন আহ্মার পিতা ভুবনপালক॥
হনুমন্ত মোর নাম খ্যাতি ত্রিভুবন।
রামকার্জ্য করিলাম মারিয়া রাবন॥

দুতে গিয়া জানাইল তথা লঙ্কেশ্বর।
স্থনিয়া পাটায়ে তাব পঞ্চ পুত্রবব॥
বক্তমুখ বক্তজির্ভ্যা বক্ত জে লুচন।
অজয় অক্ষয় সমে এই পঞ্চ জন॥
তবে তাবা বেড়িল বাজার মধুবন।
তারাসব সনে মুব হৈল মহারন॥
একে একে বন কবি সব নাস পাইল।
তাব পবে ইন্দ্রজিত তথাতে আসিল॥
নাগপাসে বন্দি কবি নিল লঙ্কাপুবি।
বাজাব সভাতে মুবে নিল বন্দি কবি॥
তবে বাজা জিজ্ঞাসিল স্থন কপিবব।
লঙ্কাতে আসি-া তৌমি কাব অনুচব॥
তবে আমি তাব তরে দিল পৈত্তর।
বামদুত হনুমান বায়ুব কুয়ব॥
জানিতে সিতাব বার্ত্তা দিগদিগান্তব।
সপ্ত দ্বিপ ভবি গিছে শ্রীবামেব চব॥
আমাবে পাটাইছে বামে কত ধবাইয়া।*
সিতাবে নিবাবে কৈল তুর কান্দে দিয়া॥
এ স্থনি নিসাচব অগ্নিহেন জলে।
বক্তবর্ন কুড়ি আক্ষি পাক দিয়া বোলে॥
মাব মাব বলি কহে বাজা দসানন।
বিভিসনে বোলে বাজা না হয়ে স্থভন॥
দুত মাইলে অধর্ম্ম লুকেত অপজস।
অসামর্থ বোলি তাব ঘুসিবেক জস॥
তবে আমি তাব পাসে কহিল নিগুড়।
মুব মৃত্তু অস্ত্রে নাই স্থন কহি মুড॥
জদি মুব লাঙ্গোড়ত বসন বান্দিয়া।
ঘৃত তৈল বহুবিধ তাথে ডালি দিয়া॥
তবে অগ্নি দিলে হয়ে আমার মরন।
নহে মুরে বধে হেন নাই কুন্থ জন॥

[এই অংশটী পরাগলীতে নাই।]

[সঞ্জয়ভারতের সভাপর্ব্ব, ঢা, বি, ৯৬৭ সংখ্যক পুথিতেও নাই।]

* বড়াইয়া।